হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত

প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত "হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রকাশকালঃ

সফর ১৪৩৬ হিজরী।

নভেম্বর ২০১৪ ইং।

মুদ্রণেঃ

মুসলিম প্রিন্টার্স

রেলইয়ার্ড, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৪৫ টাকা মাত্র।

ভূমিকাঃ

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد .....

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগ তারপর পরবর্তী যুগ, তাদের পরে তাদের পরবর্তী যুগ। (১)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

তোমাদের উপর যে যুগই অতিবাহিত হোক তার পরবর্তী যুগটি পূর্বের যুগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হবে। (২)

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী ﵀ বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ ﵁ উপরোক্ত হাদীসটি বলার পর বলেন,

لَسْت أَعْنِي رَخَاء مِنْ الْعَيْش يُصِيبهُ وَلَا مَالًا يُفِيدُهُ وَلَكِنْ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْم وَإِلَّا وَهُوَ أَقَلّ عِلْمًا مِنْ الْيَوْم الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ

সম্পদ বা সুখ-শান্তির কম বেশি হওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং পরবর্তী দিন তার পূর্বের দিন অপেক্ষা জ্ঞানের দিক থেকে কম হবে (অর্থাৎ প্রতিদিনই কিছু না কিছু

(১) সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ৬ পৃষ্ঠা-২৫৫, হাঃ ৩৩৮৮।

(২) সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ১০, পৃষ্ঠা-৩৭৪, হাঃ ৬৫৮৮।

জ্ঞান কমে আসবে)। [ফাতহুল বারী]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

মহান আল্লাহ (কাউকে ইলম দেওয়ার পর) তার অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেন না তবে তিনি আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন কোনো আলেমই বেঁচে থাকেন না তখন অজ্ঞ লোকদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তখন তাদের নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করা হয় এবং তারা ফতোয়া দেয় ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করে। (৩)

উপরোক্ত হাদীসমূহের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর পরবর্তী কয়েকটি যুগের লোকেরা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞানী হবেন। এরপর ক্রমেই জ্ঞান কমে আসবে এমনকি এক পর্যায়ে জ্ঞানী লোকেরা পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মানুষ তখন অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের অনুসরণ করবে। ফলে সকলে একযোগে

(৩) সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠা-৭৪, হাঃ ১০১।

পথভ্রষ্ট হবে। বর্তমান যুগে এই হাদীসে বর্ণিত অবস্থার মোটামুটি কাছাকাছি একটা অবস্থা আমরা অবলোকন করছি। আমরা দেখছি, বর্তমানে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম-ওলামার অভাব কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার লোকের অভাব নেই। রাস্তার হকার এখন ফতোয়ার কিতাব লিখে নিজেই সারা বাজার ঘুরে বেঁচে বেড়াচ্ছে। একেকটি আয়াত ও হাদীসের নানামুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে মানুষ এখন বিভ্রান্ত। এমতাবস্থায় পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ ও সঠিক উপায় ছিল কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে তা সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে জেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের লেখা কিতাবাদী আমাদের সঠিক পথে চলার পাথেয় হতে পারতো। কিন্তু অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা এই পথে না হেঁটে কুরআন-হাদীসকে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছে। তারা এখন আল্লাহর শরীয়ত নিয়ে খেল-তামাশা শুরু করেছে। কেউ বলছে, বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে কোথাও গেলেই সলাত কসর করতে হবে এবং রমজানের সওম ভঙ্গ করা যাবে। আরেকজন বলছে, হানাফী-শাফেয়ী পরিচয় দিলে মুশরিক হতে হবে ইত্যাদি।

বাস্তবতা হলো, সাধারন মানুষ পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের লিখিত অমর গ্রন্থাবলীকে অসম্ভব শ্রদ্ধা-সম্মান করে, তালেবে ইলমরা কম-বেশি ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করে। ফলে তারা সহজেই বর্তমান যুগের আজগুবী মতবাদসমূহের অসারতা কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারে। একারণে এসব আধুনা চিন্তা-দর্শন স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে না। এই সমস্যার নিরসন কল্পে এসব বিবেকভ্রষ্ট লোকেরা এখন পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের গ্রন্থাবলীকে ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। এসব গ্রন্থাবলীর ব্যাপারে তারা বিভিন্ন অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে তারা বেশ কিছু গ্রন্থও লিপিবন্ধ করেছে। এই সব বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো, এতে খুবই নিম্ন মানের ভাষা ব্যবহার করা হয় যা প্রায় গালা-গালির পর্যায়ে পড়ে। অনেক সময় এসব বইয়ের নামও দেওয়া হয় এমন যা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও কুরুচিপূর্ণ। নাম শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায় আর পড়তে শুরু করলে পা পর্যন্ত গরম হয়ে যায়। এ ধরনের একটি বইয়ের নাম ‘‘হিদায়া কিতাবের এ কি হিদায়াত!!’’। শামসুর রহমান নামে কোনো এক প্রফেসর বইটি লিখেছেন। হিদায়া হানাফী মাজহাবের

একটি প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ। কেবল হানাফী মাজহাব নয় বরং অন্যান্য মাজহাবের ওলামায়ে কিরামও গ্রন্থটিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হাফেজে হাদীস ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ গ্রন্থটির হাদীস সমূহকে যাচাই বাছাই করে "আদ-দিরায়া" নামক পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুভব না করলে ইবনে হাযার আল-আসক্বালানীর মতো সুনামধন্য মুহাদ্দিস এটার পিছনে সময় ব্যায় করতেন না। কিন্তু প্রফেসর সাহেব গ্রন্থটির পিছনে আদাজল খেয়ে লেগেছেন। তিনি নাকি গ্রন্থটির মধ্যে মারাত্মক মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আক্বীদা বিভ্রাট দেখতে পেয়েছেন। তার নিকট এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। হিদায়া একটি ফিকাহ গ্রন্থ। ফিকাহ গ্রন্থসমূহ লেখা হয় অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়ের উপর। তার উপর প্রতিটি মাসয়ালার সাথে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস, আরবী ভাষার ক্বওয়ায়েদ ও উসূলে ফিকাহর নিয়ম কানুনের সংযোগ থাকে। ইতিহাস বা সংস্কৃতির কোনো প্রফেসরের পক্ষে চট করে সেটা বুঝে ফেলার কথা নয়। সুতরাং হিদায়া গ্রন্থের কিছু কিছু কথা যদি তার বুঝে না এসে থাকে সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হলো, মনের

মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে খটকা লাগার সাথে সাথে হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অন্যান্য হানাফী ওলামায়ে কিরামকে গালি-গালাজ করে গ্রন্থ প্রণয়ন করা। গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে অবশ্যই বিজ্ঞ আলেম-ওলামার নিকট প্রশ্ন করে মূল বিষয়টি জেনে নিতে হতো অথবা কমপক্ষে হিদায়া গ্রন্থের মূল আরবী মতনটি ভালভাবে বুঝে নিতে হতো। দুঃখজনক যে, প্রফেসর সাহেব এগুলোর কোনোটি করেছেন বলে আমার মনে হয় নি। তার গ্রন্থটি পাঠ করে আমি একাধিক প্রমাণ পেয়েছি যে, তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দক্ষ নন এমনকি হিদায়া কিতাবের ভুল ধরার পূর্বে মূল আরবী মতনটি তিনি দেখেননি বা দেখলেও ভাল মতো বোঝেননি। যদি বুঝতেন তাহলে তার বেশ কিছু প্রশ্নের সমাধান এমনিতেই হয়ে যেতো। তিনি আসলে ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অনুবাদটি পড়েছেন। আর সেটাও যে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন তা নয়। যেহেতু আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, অনুবাদ গ্রন্থটি হতে উদ্ধৃতি উল্লেখের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে। হয়তো প্রফেসর সাহেব ইচ্ছাকৃত কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন অথবা মনোযোগের অভাবের কারণে অনিচ্ছাকৃত বিষয়টি ঘটেছে। বলা বাহুল্য যে, এটি বেশ

গুরুতর অপরাধ। যদি ধরেও নিই, প্রফেসর সাহেবের এই অপরাধটি গুরুতর নয় তবু বলব, সরাসরি আরবী গ্রন্থটির পরিবর্তে অনুবাদটির উপর তীব্র আক্রমণ করার বিষয়টি ঐ ব্যক্তির মতো হাস্যকর যে, আয়নায় কারো চেহারা দেখে সেখানেই ঘুষি মারতে শুরু করে। এর কারণ হলো, অনুবাদ করার সময় মুল গ্রন্থের অনেক বিষয় অনুবাদক তার নিজের মতো করে বর্ণনা করেন। সেক্ষেত্রে ভুলটি মূল গ্রন্থের নাও হতে পারে। হতে পারে অনুবাদকই ভুল করেছেন। প্রফেসর সাহেব অবশ্য এসব নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করেন নি। তিনি এক আন্দাজে কেবল হিদায়ার গ্রন্থকারকে গালি-গালাজ করে গেছেন। এসবই সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি এধরনের বোকামীতে ভরপুর। একজন প্রফেসর এতটা নির্বোধ হতে পারে তা ভাবা যায় না। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, গ্রন্থটি প্রফেসর সাহেব নিজের হাতে লেখেন নি। সম্ভবত গ্রন্থটি লিখতে লিখতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সেই সুযোগে কোনো বাচ্চা ছেলে দুষ্টমী করে বাকিটা লিখে দিয়েছে। প্রফেসর সাহেবের লেখা ‘‘ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর একি আজব ফাতওয়া’’ নামে আরেকটি বই রয়েছে। সেখানে তিনি ফতোয়ায়ে আরমগীরীর বিভিন্ন ভুল ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা

করেছেন। সেখানেও একই রকম বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার ঝকমারী প্রদর্শন করেছেন। এসব গ্রন্থের প্রতিবাদ লিখতে যাওয়াটা অনেকটা মুচির পাতে খেতে বসার মতো। এটা বেশ দুঃখজনক যে আজ আমাকে সেই অরুচিকর কাজটিই করতে হচ্ছে। যেহেতু এই লেখকের চেয়েও বেশি নির্বোধ লোক রয়েছে যারা এসব বইয়ের অপপ্রচারকে সত্য মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছে। যারা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামকে নিন্দা-মন্দ করে তাদের বিরুদ্ধে আলেমরা বিভিন্ন বই-পুস্তক লিখেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ এ বিষয়ে "রফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম" তথা যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরামের ব্যাপারে বিভিন্ন অপবাদের জবাব" নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি যে দায়িত্ব অনুভব করে উক্ত বইটি লিখেছিলেন আমি অনুরূপ দায়িত্ব অনুভব করছি। একারণেই "হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" নামক গ্রন্থটির প্রতিবাদে ভিন্ন একটি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা করেছি। আমি গ্রন্থটির নাম দিয়েছি, "হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত"। হিদায়া কিতাবের বিপক্ষে প্রফেসর সাহেবের এই অপপ্রচারকে অসার প্রমাণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

হানাফী মাজহাবের সনদঃ

প্রফেসর সাহেব আলোচনার শুরুতেই যে বিষয়ে আপত্তি করেছেন তা হলো, হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম আবু হানিফার মতামত উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার কোনো রেফারেন্স বা সনদ উল্লেখ করেন নি। এ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে প্রফেসর সাহেব বলেন,

"অথচ ইমাম সাহেবের মৃত্যুর ৩৬১ বছর পর তার জন্ম। এ শত শত বছর পর ইমাম সাহেবের মতামত পেশ করতে হলে হয়ত তাকে সনদসূত্র দিতে হত নতুবা ইমাম সাহেবের লিখিত কোনো কিতাবের হাওলা বা উদ্ধৃতি পেশ করতে হতো। পেশকৃত মত ইমাম আবূ হানীফার কি তার মত নয় এটা বুঝবার বা প্রমাণ করবার কোনো সুযোগ নেই।"

এর পর তিনি বলেন,

কিন্তু সব থেকে তাজ্জবের ব্যাপার হলো এমন প্রমাণপঞ্জী বিহীন ও সনদসূত্র বিহীন মনুষ্য রচিত একটা কিতাবকে বলা হলো মহাগ্রন্থ!! [পৃষ্ঠা-৮]

এখানে তিনি দুটি মন্তব্য করেছেন,

ক. ইমাম আবু হানিফার মতামত উল্লেখের সময় হিদায়ার গ্রন্থকার কোনো সনদ বা উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন

নি। অতএব তার গ্রন্থটি প্রমাণবিহীন।

খ. হিদায়ার কিতাবে ইমাম আবু হানিফার যেসব মতামত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আদৌ তার মত কিনা তা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই।

বলা বাহুল্য যে, দুটি মন্তব্যই অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। প্রথমত কুদুরী বা হিদায়া গ্রন্থ মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত কিতাব। প্রফেসর সাহেবের মতো আম লোকের জন্য এটা লেখা হয় নি। হানাফী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন মতামতের সনদ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ সেই সব ওলামায়ে কিরামের মনে থাকার সুবিধার্থে অনেকটা ডায়রী আকারে এসব মুখ্তাসার (সংক্ষিপ্ত) কিতাব লেখা হয়েছে। যেহেতু ফিকাহ শাস্ত্র একটি সুবিশাল শাস্ত্র, তাই ফিকাহ শাস্ত্রের মূল মাসয়ালাগুলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একারণে প্রতিটি মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম তাদের নিজ নিজ মাজহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের উপর মুখতাসার তথা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন, শাফেঈ মাজহাবের আল-মুহাজ্জাব, হাম্বালী মাজহাবের মুখতাসারুল খিরকী, মালেকী মাজহাবের মুখতাসারুল খলীল ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে কেবল বিধানটি উল্লেখ করা হয় বিস্তারিত দলিল প্রমাণ উল্লেখ

করা হয়না। যেহেতু অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম মূল মাসয়ালাটি পাঠ করার সাথে সাথেই তার সাথে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রমাণ অনুধাবন করতে পারেন। পরবর্তীতে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম সাধারন তালেবে ইলমদের বুঝার সুবিধার্থে এসব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন। ইমাম নাব্বী কৃত আল-মাজমু হলো আল-মুহাজ্জাবের ব্যাখ্যা, ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী হলো, মুখতাসারুল খিরকী এর ব্যাখ্যা ইত্যাদি। হিদয়া গ্রন্থেরও বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, ফাতহুল কাদীর, আল-ইনায়া, আল-বিনাইয়া ইত্যাদি। নিয়ম হলো, কোন্ মতটির ব্যাখ্যা ও সনদ কি এ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ কেবল তারাই এসব সংক্ষিপ্ত কিতাব পাঠ করবেন আর যারা এতটা সংক্ষিপ্ত কিতাবের আগা-মাথা কিছুই বোঝে না তারা এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা সমূহ পাঠ করবে। প্রফেসর সাহেব এর কোনটিই করেন নি। না তিনি মূল গ্রন্থের অর্থ বুঝতে পেরেছেন আর না অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠ করেছেন। তিনি কেবল গোঁয়াড়ের মতো আপত্তি করে বলেছেন, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের মধ্যে কেনো বিস্তারিত উদ্ধৃতি ও সনদ উল্লেখ করা হলো না? এ দাবী অবশ্য তার একার নয়। বর্তমান যুগের ডজন

খানেক মাদানী আলেম একই দাবী করেছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের মধ্যে বিস্তারিত সনদ উল্লেখের বিষয়টিই যে হাস্যকর তা তারা অনুধাবন করতে পারেন নি। আমরা এসব মাদানী হুজুরদের বলব, যে সহীহ বুখারীকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন (আমরাও বাসি) সেই সহীহ বুখারীতেও এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা তা'লীকান বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী সেগুলোর সনদ ও উদ্ধৃতি কিছুই উল্লেখ করেন নি। প্রফেসর সাহেব সম্ভবত এ সম্পর্কে জানেন না কিন্তু মাদানী হুজুরদের বিষয়টি জানা থাকার কথা। যাই হোক, সহীহ বুখারীর এসব তা'লীক কৃত হাদীসের সনদ বর্ণনা করে হাফেজ ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ 'তাগলীকুত তা'লীক' (تغليق التعليق) নামে পৃথক একটি কিতাবও রচনা করেছেন। তাছাড়া বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতেও তিনি এসব হাদীসের সনদ বর্ণনা করেছেন। এখন বুদ্ধিমান গবেষকদের কি করা উচিৎ? ইমাম বুখারী এসব হাদীসের সনদ বা উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন নি বিধায় তাকে গালিগালাজ করা, নাকি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাঠ করে এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের কিতাবাদি পাঠ করে ঐ সকল হাদীসের সনদ খুঁজে বের করা?

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তাতে আল্লাহর রাসুল, তার সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের থেকে অনেক কথা বর্ণনা করেছেন যার কোনো সনদ বা উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন নি। কেবল বলেছেন, বালাগানি (بلغني) যার অর্থ হয়, আমি জানতে পারেছি বা আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, আল্লাহর রাসূল নিজে বা তার অমুক সাহাবা এমনটি বলেছেন। এমন বর্ণনা মুয়াত্তা মালিকে বহুসংখ্যক রয়েছে। এখন প্রফেসর সাহেব – "মুয়াত্তা মালিকে একি অলিক কাহিনী!!"- নামে কোনো বই রচনা করে ইমাম মালিককে গালি-গালাজ করবেন কি?

তার মতো বোকা লোকেরা এধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়তো দ্বিধা করবে না। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তাদের কর্মপন্থা এমন হয় না। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ তারা তালাশ করেন না বরং দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হলে ঐ সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা অন্য কোনো কিতাবাদিতে তা সন্ধান করেন। প্রফেসর সাহেবের উচিৎ একগুয়েমী পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় পন্থাটি অনুসরণ করা।

প্রফেসর সাহেব বলেছেন, হিদায়ার কিতাবে যেসব মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তা আদৌ ইমাম আবু হানীফার মতামত কিনা তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

আরবীতে একটা প্রবাদ আছে, (المرأ يقيس علي نفسه) ‘‘মানুষ নিজের উপর কিয়াস করে’’। সোজা বাংলায় এর অর্থ হয়, একজন লোক সবাইকে নিজের মতো মনে করে। প্রফেসর সাহেব যতটা বোকা হানাফী মাজহাবের সকল ওলামায়ে কিরামকে তিনি তেমন বোকা মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক। একারণেই তিনি মনে করেছেন হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম ইমাম আবু হানীফার মতামত কোনোরূপ সনদ ছাড়াই বর্ণনা করেন এবং যাচাই বাছাই না করেই গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেছেন তার স্বল্প জ্ঞানে যেহেতু ইমাম আবু হানীফার মতামতের কোনো সনদ তিনি খুঁজে পান নি অতএব আদৌ তার কথার কোনো সনদ নেই। ব্যাপারটা অনেকটা অন্ধের হাতি দেখার মতো। অনেক হাতড়ে সে কেবল হাতির লেজটি হাতে পায় আর সেটিকেই হাতি মনে করে আক্ষেপ করে বলে, মানুষ বলে, হাতি নাকি খুবই মোটা কিন্তু এখন দেখছি আমার হাতের সমানও নয়! আফসোসের বিষয় হলো কিছু কিছু মাদানী হুজুরও এই অন্ধত্বে প্রফেসর সাহেবের সঙ্গী হয়েছেন। তারা হানাফী মাজহাবকে সনদবিহীন মনে করেন। আর দুঃখ করে বলেন, আবু হানীফার মতো অত বড় ইমাম কি আর এসব আজগুবী

কথা বলতে পারে? নিশ্চয় এগুলো তার নামে বানানো হয়েছে। প্রফেসর সাহেবও কথার মধ্যে বারবার ইমাম আবু হানীফাকে ইমাম বলে সম্মোধন করেছেন। তারপর ইমাম সাহেবের ছাত্র ও অনুসারীদের উপর এমন অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন যা শুনলে শয়তানও লজ্জা পায়। কথায় বলে, ঝি কে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়া। তাদের আসল রাগ কিন্তু ইমাম সাহেবের উপর। তবে ইমাম সাহেবের নামে সরাসরি কিছু বললে মানুষ ঝাঁটা পেটা করতে পারে এই ভয়ে ইমাম সাহেবের উপর কৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করে হানাফী মাজহাবের অবশিষ্ট ওলামায়ে কিরামকে পাপাচারী ও অনাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব যেসব ছাত্রকে সারাটা জীবন শিক্ষা দিয়েছেন তারাই যখন মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী তখন ইমাম সাহেবকেই বা বাদ দেওয়ার কি দরকার! যদি ইমাম আবু হানীফার সকল ছাত্র ও অনুসারীদের ভন্ড ও মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা যে মহান ইমাম ছিলেন সেটা কিভাবে প্রমাণিত হয়? সেক্ষেত্রে বিনা প্রমাণে এক জন ব্যক্তিকে বারবার ইমাম, ইমাম বলে সম্মোধন করার কারণ কি? এই

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ নয় তো! তাই বলব, মুনাফেকী না করে অন্তরে যেটা আছে তা মুখে প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল।

এখন মুল প্রসঙ্গে কথা হলো, হানাফী ওলামায়ে কিরাম তাদের মাজহাবের সনদ সম্পর্কে মোটেও বেখবর নন। বরং তারা সনদের ব্যাপারে তথাকথিত আহলে হাদীসদের চেয়ে ঢের বেশি খোঁজ-খবর রাখেন। আজ পর্যন্ত যারা বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে হাদীসের দারস দেন তারা সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থসমূহ কার নিকট শিক্ষা করেছেন এবং তিনি কার নিকট শিক্ষা করেছেন এভাবে স্বয়ং গ্রন্থকার পর্যন্ত সনদ মুখস্ত রেখেছেন। এই বিষয়টিকে তাদের পরিভাষায় বলা হয়, হাদীসের সনদ দেওয়া। যদিও এখন আর এই সনদের বিশেষ গুরুত্ব নেই তবু ঐতিহ্যগত ভাবে তারা বিষয়টাকে আজ পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। প্রশ্ন হলো, যারা নিজেদের হাদীসের শিক্ষকের সনদ সম্পর্কে সচেতন তারা কি নিজেদের মাজহাবের ইমামের সনদ সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন! কিন্তু সমস্যা হলো, প্রফেসর সাহেব নিজে এবং তার চিন্তা-দর্শনে বিশ্বাসী অন্যান্য মাদানীগণ এসব সুক্ষ্ম বিষয়ে খুব কমই জ্ঞান রাখেন। তারা বলেন, ইমাম আবু হানীফা কি কোনো বই লিখেছেন? এই প্রশ্নটি

তাদের নিকট খুব জটিল মনে হয়। আমি বলি, ইমাম আবু হানীফা বই লেখেন নি কিন্তু তার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ বহু সংখ্যক বই লিখেছেন। সেখানে তিনি স্বীয় উস্তাদের মতামত বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফার নিকট ফিকাহ শিক্ষা করেন এবং ইমাম মালিকের নিকট হাদিস শিক্ষা করেন। এভাবে তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন ইমামের জ্ঞান তার মধ্যে সমন্বিত হয়। ইলমের জগতে তার যথেষ্ট কদর ও প্রসিদ্ধি রয়েছে। প্রশ্ন হলো, ইমাম মুহাম্মদের মতো প্রসিদ্ধ ছাত্র যদি স্বীয় কিতাবে ইমাম আবু হানিফা হতে কিছু বর্ণনা করেন তবে এটা কি দলীল নয়? ইমাম আবু হানীফা নিজে কোনো বই লেখেন নি এই যুক্তিতে কি এসব কথাকে বাতিল করা যায়? রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তো কোনো বই লেখেন নি, লেখেন নি তার কোনো সাহাবাও। এখন যেসব হাদীসের গ্রন্থ পাওয়া যায় তার সবই রসুলের ওফাতের এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগ অতিবাহিত হওয়ার বেশ পর লেখা হয়েছে। এখন একথা বলার কি সুযোগ আছে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে কোনো বই লেখেন নি অতএব, কোনটি তার কথা আর কোনটি তার কথা নয় তা যাচাই-বাছায়ের সুযোগ নেই?

কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কথা বলে আর বিশ্বস্ত সূত্রে সেটা জানা যায় এটাই কি যথেষ্ট নয়?

একজন ব্যক্তি যা কিছু বলে যদি তার প্রসিদ্ধ কোনো ছাত্র সেটা লিপিবদ্ধ করে তবে তার চেয়ে অধিক শক্ত সনদ আর কি হতে পারে! যদি কোনো সাহাবা কোনো হাদীসের গ্রন্থ লিখতেন তবে সেটা নিশ্চয় সহীহ বুখারীর চেয়েও বেশি সহীহ বলে গণ্য হতো। কিন্তু আফসোস তেমন কোনো গ্রন্থ আমরা পায় নি। তবে মুহাদ্দিসীনরা কঠোর পরিশ্রম করে পরবর্তীতে যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সেসব গ্রন্থের হাদীস যাচাই বাছায় করে সহীহ প্রমাণিত হলে আমরা তা অনুসরণ করি। কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের মুহাদ্দীসীনে কিরাম যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন সে কাহিনী সম্পর্কে যারা জানে না তারা হাদীসের উপর আপত্তি করে। আর যারা সে সম্পর্কে জানে তারা মুহাদ্দিসীনে কিরামকে অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানায়।

ইমাম আবু হানীফার মতামত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হানাফী আলেমরা যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন সে সম্পর্কে না জানার কারণেই অজ্ঞ ও মুর্খরা বিষয়টির উপর আপত্তি উত্থাপন করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত

জানলে যে কেউ তাদের প্রশংসা না করে পারবেন না। হানাফী ওলামায়ে কিরাম ইমাম আবু হানিফার মতামত গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে অত্যাধিক কঠোরতা আরোপ করে থাকেন। যে কেউ ইমাম আবু হানীফার নামে কোনো কথা বর্ণনা করলেই তারা বিনা বিচারে তা গ্রহণ করেন এমন কখনও নয়। তারা কেবল ইমাম মুহাম্মদের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবকে এ বিষয়ে মূল কিতাব হিসেবে গণ্য করেন। উক্ত কিতাব সমূহ হলো,

ক. আল-মাবসুত (المبسوط)

খ. আল জামি আস-সগীর (الجامع الصغير)

গ. আল জামি আল কাবীর (الجامع الكبير)

ঘ. আস-সিয়ার আল-কাবীর (السير الكبير)

ঙ. আস-সিয়ার আস-সগীর (السير الصغير)

চ. আয-যিয়াদাত (الزيادات)

আব্দুল হাই লখনাভী ﵀ কৃত আন-নাফে আল-কাবীর পৃষ্ঠা- ১০ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এসব বইয়ের গণনার ক্ষেত্রে কিছু বেশ-কম আছে। যেহেতু কেউ জামি আস-সগীর ও জামি আল-কাবীরকে একই গ্রন্থ হিসেবে বর্ণনা করে। আবার অনেকে সিয়ার আল-সগীর ও সিয়ার আল কাবীরকে সংক্ষেপে সিয়ার

বলে আখ্যায়িত করে। তবে মোট কথা হলো ইমাম মুহাম্মদ লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব সমূহই হানাফী মাজহাবের মূল কিতাব হিসেবে গণ্য। এসব কিতাবকে জহিরে রেওয়ায়েত (ظاهر الرواية) তথা 'প্রকাশ্য বর্ণনা' বা আল-উসুল (الأصول) তথা 'মূল কিতাব' নামে অবিহিত করা হয়। এসব কিতাবের বাইরে অন্যান্য কিতাবে যেসব মাসয়ালা বর্ণনা করা হয় সেগুলোকে হানাফী ওলামায়ে কিরাম নাওয়াদির (النوادر) নামে আখ্যায়িত করেন। মুল কিতাবের বিপরীত হলে এসব মাসয়ালা গ্রহণযোগ্য নয়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট প্রশ্ন হলো, সনদের ব্যাপারে হানাফী ওলামায়ে কিরাম যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তা মুহাদ্দিসীনে কিরামের সতর্কতার তুলনায় কোনো অংশে কম কি? আর তথাকথিত আহলে হাদীসদের নিকট প্রশ্ন হলো, যখন ইমাম মুহাম্মদ তার কিতাবে লেখেন, আমার উস্তাদ আবু হানীফা এই মত দিয়েছেন আপনারা কি এটাকে প্রমাণিত মনে করেন নাকি মিথ্যা মনে করেন? যদি কেউ ইমাম মুহাম্মদকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে তাহলে ইমাম মালিককেই বা কেনো সত্যবাদী মনে করবে? ইমাম মালিক যখন নাফের মাধ্যমে ইবনে উমর থেকে রসুলের কোনো

হাদীস বর্ণনা করেন তখন সেটাই বা সহীহ হয় কি করে? এ পন্থায় কি দ্বীন-ঈমান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে? এতদূর আলোচনার পর, ইমাম আবু হানীফার মতামত সমূহের মধ্যে কোনটি তার মত আর কোনটি নয় তা বোঝার কোনো উপায় নেই- এই কথাটি কি পাঠকের নিকট সঠিক মনে হয়?

উপরোক্ত আলোচনাতে আমরা ইমাম আবু হানীফার মতামতের সনদ বর্ণনা করেছি এবং হিদায়ার গ্রন্থকার সেগুলো কেনো বর্ণনা করেন নি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছি। এর মাধ্যমে, ইমাম আবু হানীফার মতামত সমূহের আদৌ কোনো সনদ আছে কিনা বা থাকলে হিদায়ার গ্রন্থকার সেটা কেনো বর্ণনা করেন নি আহলে হাদীসদের বহুল প্রচলিত এই অভিযোগটি খন্ডিত হয়। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

মাথা মাসেহ করা সম্পর্কে

প্রফেসর সাহেব এর পর বলেন, (হিদায়ার) গ্রন্থকার বলেন, মাথা মাসেহ-এর ক্ষেত্রে মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্পর্শ করা ফারয। অথচ আল কুরআনে সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্ – এর ৬ নং আয়াতে সম্পূর্ণ মাথা

মাসাহ করার হুকুম।

এর পর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ এর হাদীসটি উল্লেখ করেন, যেখানে সম্পূর্ণ ওজুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন বলে উল্লেখ আছে। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করে আবার যেখান থেকে শুরু করেছেন সেখানে ফিরিয়ে এনেছেন বলে বর্ণিত আছে। এছাড়া উক্ত হাদীসে ওযুর অঙ্গ সমূহ তিন বার করে ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। [৪] এরপর তিনি স্বভাব সুলভ গালা-গালি শুরু করেছেন। রসুলের শেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে হিদায়ার গ্রন্থাকারের কথাটি মানা যাবে কি না বা আল্লাহ যেখানে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ করেছেন সেখানে হিদায়ার গ্রন্থকার নিজের খেয়াল খুশি মতো ১/৪ অংশ মাসেহ করা ফরজ বললে তিনি আশেকে রসুল হিসেবে গণ্য হবেন কিনা এসব প্রশ্ন উত্থাপণের পর মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

ফারয্ হুকুমদাতা আল্লাহ ও তার রাসুলকে মানবেন না ফারয হুকুমদাতা হিদায়ার লেখককে মানবেন? [পৃষ্ঠ-৯

---

[৪] সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠা-১১৮, হাঃ ১৮৫।

ও ১০]

প্রফেসর সাহেবের এই অভিযোগটি তার স্বভাবজাত অজ্ঞতা ও অপূর্ণতাকে আরেকবার প্রকাশিত করে। কিন্তু এই অজ্ঞতাকে তিনি উদ্ভট গালি-গালাজের মাধ্যমে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করেছেন। কথায় বলে খালি কলসি বাজে বেশি। তার অবস্থাটাও হয়েছে অনুরূপ। মূল আলোচনা শেষ করার আগেই হুকুম দাতা কে, ফরজ করার ক্ষমতা কার এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে পাঠকের মস্তিস্ককে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছেন। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে কেবল তিনিই আল্লাহকে হুকুমদাতা বলে মানেন আর হানাফী মাজহাবের সকল আলেম-ওলামা হিদায়া কিতাবের গ্রন্থকারকে হুকুম দাতা মানে। তার অবস্থা পুরোপুরি খারেজীদের মতো যারা আলী ﵁ সহ সকল সাহাবায়ে কিরামকে কাফির-মুশরিক মনে করতো। যেহেতু তারা মুসলিমদের মধ্যকার বিবাদ নিরসনের জন্য বিচারের ভার আবু মুসা আল-আশয়ারী ﵁ ও আমর ইবনুল আস ﵁ এর উপর অর্পণ করেন। তারা বলতো, (ان الا لله الحكم) হুকুমদাতা কেবল আল্লাহ। অতএব, মানুষের উপর বিচারের ভার অর্পণ করে সাহাবায়ে কিরাম কাফির হয়ে গেছে [নাউযু বিল্লাহ্]। হুকুম দাতা

কে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ও তাদের গ্রন্থকারদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে প্রফেসর সাহেবরা খারেজীদের সুন্নাত জিন্দা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। হুকুম দাতা যে আল্লাহ এ বিষয়ে কি কোনো মুসলিম দ্বিমত করতে পারে? কিন্তু দ্বিমত হয় হুকুম দাতার হুকুম বোঝার ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগে ঘটিত দুটি ঘটনার কথা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। দুটি ঘটনাই সহীহ বুখারীতে বর্ণিত।

সাহরীর সময় নির্ধারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]

তোমরা খাও এবং পান করো যতক্ষণ না সাদা সুতা কালো সুতা হতে পৃথক হয়ে যায়। [বাকারা/১৮৭]

এই আয়াতে সাদা সুতা ও কালো সুতা বলতে আসলে রাতের আধার থেকে দিনের আলো প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার নিকটস্থ সাহাবায়ে কিরাম আয়াতটির সঠিক অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হলেও সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, আদী ইবনে হাতিম তাঈ ﷺ সহ একদল সাহাবী মনে করেন এখানে প্রকৃতই কালো

সুতা ও সাদা সুতা উদ্দেশ্য। তারা বালিশের নিচে একটি সাদা আর একটি কালো সুতা রেখে কখন দুটোকে আলাদাভাবে চেনা যায় এটা লক্ষ্য করেন। এর ফলে তারা অধিক সময় ধরে পানাহার করেন। পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে তাদের শুধরে দেন কিন্তু পূর্বে কৃত সওম নতুন করে আদায় করতে বলেন নি। বা তাদের মারাত্মক পাপ হয়েছে এমন মন্তব্যও করেন নি। [৫]

এই ঘটনা প্রমাণ করে, আল্লাহর কোনো একটি হুকুমের অর্থ কি তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিমত হতে পারে। যখন রাসুল ﷺ বিদ্যমান ছিলেন তখন যেসব দ্বিমত ঘটেছে তিনি সেগুলোর মধ্যে সঠিক মত কোনটি তা ঠিক করে দিয়েছেন। তবে কাউকে তিরষ্কার করেন নি। যদি তার মৃত্যুর পর কোনো একটি আয়াত সম্পর্কে দ্বিমত হয় তবে সঠিক মত কোনটি তা আর জানা সম্ভব হবে না। যেহেতু তখন ওহী নাযিল হওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে দুটি মতের কোনোটিকে তিরষ্কার করা যাবে না। অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই আমাদের এই সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন।

---

[৫] সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-২৪৮, হাঃ ১৭৯৫, ১৭৯৬।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

কেউ যেনো বনু কুরাইজায় না পৌঁছে আসরের সলাত আদায় না করে।

সাহাবায়ে কিরাম তখনই বনু কুরাইজার দিকে রওয়ানা হয়ে যান কিন্তু পথিমধ্যে আসরের সলাত ফওত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তারা দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে একদল বলেন, রসুল ﷺ যেভাবে বলেছেন আমরা তাই করবো। ফলে তারা বনু কুরাইজায় পৌঁছানোর পর আসরের সলাত আদায় করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে তখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। অন্য একটি দল বলেন, রসুলের উদ্দেশ্য আসলে এমন ছিল না বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, "দ্রুত যাও"। তারা রাস্তার মধ্যেই আসরের সলাত আদায় করে নেন। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে,

فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

পরে ঘটনাটি রসুলুল্লাহ ﷺ কে জানানো হয় কিন্তু তিনি কাউকে তিরষ্কার করেন নি। [৬]

---

[৬] সহীহ বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ২, পৃষ্ঠা-১৯৯, হাঃ ৮৯৯।

এসব ঘটনায় দেখা যাচ্ছে আল্লাহ বা রসুলের হুকুম বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও দুদল সাহাবা দুরকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রফেসর সাহেব কি বলবেন, এখানে কোনো একটি দল আল্লাহকে হুকুমদাতা মানতে অস্বীকার করেছে? প্রকৃত সত্য হলো তারা সবাই আল্লাহকে হুকুমদাতা হিসেবে মান্য করেছেন কিন্তু সেই হুকুমদাতার হুকুমটির অর্থ কি তা বুঝার ব্যাপারে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই তাদের কাউকেই তিরষ্কার করা উচিৎ নয়। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অন্যান্য মাজহাবী ওলামায়ে কিরামের অবস্থাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। তারা কেউই ওযুর আয়াতটি অস্বীকার করেন নি। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ﷺ বর্ণিত হাদীসটিও তাদের অজানা নয়। কিন্তু এসবের সঠিক অর্থ কি হতে পারে সেটা নিয়েই তাদের মাঝে দ্বিমত হয়েছে। সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এখানে দ্বিমতের সুযোগও রয়েছে। ঘটনা হলো, সূরা মায়েদার আয়াতে সলাতের আগে মুখ-হাত ধৌত করতে এবং মাথা মাসেহ করতে বলা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুখ ধৌত করার সময় আল্লাহ বলেন, (فاغسلوا وجوهكم) কিন্তু মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, (وامسحوا برؤوسكم)। মুখ ধৌত করার ক্ষেত্রে সরাসরি মুখের

কথা বলা হয়েছে কিন্তু মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে সরাসরি মাথা শব্দটি উল্লেখ না করে তার পূর্বে বি (ب) শব্দটি অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বি (ب) শব্দটি আরবীতে "কিছু অংশ" বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অনেক সময় শব্দটি অতিরিক্ত হিসেবেও আসে। ইবনে রুশদ ﵀ বিদায়াতুল মুজতাহিদে এবং ইমাম সুয়ূতী ﵀ আল ইতকানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে মাথার কিছু অংশ মাসেহ করা বোঝাবে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাথার সম্পূর্ণ অংশ মাসেহ করা বোঝাবে। মুখ ধৌত করার ক্ষেত্রে বি (ب) শব্দটি উল্লেখ নেই বিধাই সম্পূর্ণ মুখ ধৌত করতে হবে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। কিন্তু মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে বি (ب) শব্দটি উল্লেখ আছে বিধায় এখানে বি (ب) শব্দটির কোন্ অর্থ গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। "কিছু অংশ" অর্থে, নাকি অতিরিক্ত অর্থে। এ কারণে মাথা মাসেহ করার ফরজ কতটুকু, কিছু অংশ নাকি সম্পূর্ণ অংশ এ ব্যাপারে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে।

প্রফেসর সাহেব বলেছেন, আল্লাহ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে বলেছেন। কথাটি মিথ্যা। আরবী ভাষা সম্পর্কে কম জ্ঞানের কারণে তিনি এমনটি বলেছেন। বরং আল্লাহ যা বলেছেন তার দুটি অর্থ হতে পারে।

আলেমদের একেক দল একেক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাদের কাউকে তিরষ্কার করা যাবে না।

অনেকে বলতে পারে, উক্ত আয়াতে দুটি সম্ভাবনা থাকলেও আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে আমরা দেখছি আল্লাহর রসুল সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ। এরা আসলে উপরোক্ত আয়াতটির মতোই হাদীসটির গভীরে প্রবেশ করতেও অক্ষম। একটা সহজ প্রশ্ন হলো আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেছেন তার সবই কি ফরজ? উদাহরণস্বরূপ হাদীসটিতে উল্লেখ আছে, তিনি কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করেছেন, নাকে পানি দিয়েছেন, কুলি করেছেন এবং প্রতিটি অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করেছেন। এগুলো সবই কি ফরজ? প্রতিটি অংশ তিন বার ধৌত করাও কি ফরজ? ছোট ছেলেরাও জানে যে, এগুলোর সব ফরজ নয় বরং কিছু সুন্নাত বা মুস্তাহাবও রয়েছে। ওজুর অংগসমূহকে একবার ধৌত করা ফরজ তবে দুই বা তিন বার ধৌত করা মুস্তাহাব তথা এটা না করলে ওজু হয়ে যাবে কিন্তু করলে অধিক সওয়াব। যেহেতু বুখারী শরীফের অন্য রেওয়াতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ ওযুর অংগসমূহ একবার, দুই বার বা তিন

বার ধৌত করতেন। মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করেছেন এর অর্থ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরজ এটা সুনিশ্চিত নয় বরং এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, মাথার কিছু অংশ মাসেহ করা ফরজ তবে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করলে অধিক সওয়াব হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার নিজেও সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করাকে সুন্নাত হিসেবে গণ্য করেছেন [মুলঃ আওয়ালাইন পৃষ্ঠা-২১, ইঃফাঃ খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৭]।

দেখা যাচ্ছে উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে হিদায়ার গ্রন্থকার অধিক অবগত ছিলেন। অবশ্য প্রফেসর সাহেবরা তার দক্ষতা স্বীকার করতে চান না।

নাবিয দিয়ে ওজু করার বিধান

এরপর প্রফেসর সাহেব নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) দিয়ে ওযু করা বা নাবীয পান করা বৈধ হওয়ার বিষয়ে আপত্তি করেছেন। এ বিষয়ে তিনি দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ক. রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাবীয এবং নেশাকারক পদার্থ দ্বারা ওযু করা না জায়িজ।

খ. যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম।

এসব কিছু উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

এখন আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম ও নাজায়িয করেন ইমাম আবু হানিফা (রহ:) তা কিভাবে জায়িয ও হালাল করতে পারেন? অথচ হিদায়াতে ইমাম সাহেবের নামে ঐ কথাই লেখা হলো। এ কেমন প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থ পাঠক বুঝুন! [পৃষ্ঠা-১১]

প্রফেসর সাহেব বলেছেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নাবীয এবং নেশাকারক পদার্থ দ্বারা ওযু করা নাজায়িয" এর পর তিনি সহীহ বুখারীর দলীল দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে কিন্তু এই হাদীস নেই। তবে সহীহ বুখারীতে হুবহু এই নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে এ সম্পর্কে বিভিন্ন আলেম-ওলামার বক্তব্য রয়েছে এবং ঐ হাদীসটি রয়েছে যাতে বলা হয়েছে, "নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয় হারাম"। সম্ভবত প্রফেসর সাহেব, ইমাম বুখারীর কথাটিকে রাসুলের কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়র চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই গ্রন্থের শুরুতে রাসুলের নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সেই হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রাসুলের নামে যে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে জাহান্নামে স্থান করে নেয়। হিদায়া কিতাবের ভুল

ধরতে গিয়ে কি প্রফেসর সাহেব হেদায়েত থেকে সরে পড়তে চান?

যাই হোক, দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ বুখারীতেই রয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

যেসব পানীয় নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম। [৭]

এই হাদীসটির উপর নির্ভর করে প্রফেসর সাহেব প্রশ্ন করেছেন, ইমাম আবু হানীফা এই হাদীসের বিরুদ্ধে গিয়ে নাবীযকে কিভাবে বৈধ বলতে পারেন! কিন্তু হিদায়ার গ্রন্থকার তার নামে এ কথা চালিয়ে দিয়েছেন।

এসব মুর্খ প্রফেসরদের ভন্ডামী দেখলে সত্যপন্থী মুসলিমদের রাগ না হয়ে পারে না। প্রথমত তারা হাদীস চুরি করে। কেবল নিজেদের পক্ষের হাদীসটি বর্ণনা করে। ভিন্ন মতের পক্ষের হাদীস গোপন করে। নাসাঈতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

মদ নিজেই হারাম, তা কম বা বেশি যে কোনো পরিমান পান করা হারাম। কিন্তু অন্যান্য পানীয় যে পরিমান পান করলে মাতালতা আসে সেই পরিমান

---

[৭] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠাঃ ১৪০, হাঃ ২৪১।

হারাম। [৮]

অর্থাৎ সরাসরি মদ ছাড়া অন্যান্য নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের কম পরিমান পান করা যায়। তবে এতদূর পান করা যাবে না যাতে নেশা সৃষ্টি হয়। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে কম পরিমান পান করাও অবৈধ।

ইমাম আবু হানাফী হুবহু এই মত ব্যক্ত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে মাওকুফভাবে এবং রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মাওকুফ হাদীসটি সম্পর্কে আল-হাইছামী বলেন, (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ) "তিবরানী হাদীসটিকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কোনো কোনো সনদের রাবীরা সহীহ হাদীসের রাবী"। [মাযমায়ে যাওয়ায়েদ]

মাওকুফ হাদীসটিকে শায়েখ আলবানীও সহীহ বলেছেন। [দঈফা-হাঃ ১২২]

এখন প্রফেসর সাহেবকে প্রশ্ন করি, এখানে এমন বলার সুযোগ আছে কি যে ইবনে আব্বাস ﷺ আল্লাহর রসুলের হাদীসকে অগ্রাহ্য করেছেন অথবা ইমাম নাসাঈ ইবনে আব্বাসের নামে এই কথাটি চালিয়ে দিয়েছেন

---

[৮] নাসায়ী ইঃফাঃ খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৯১ হাঃ ৫৬৮৩।

এবং শায়েখ আলবানী খায়েশাতের বশবর্তী হয়ে বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন? এভাবে আলেম-ওলামাদের উপর আক্রমণ করলে হাদীস শুনবেন কার কাছ থেকে? দুটি হাদীসের মধ্যে কোনো একটিকে বেশি সহীহ মনে করুন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে আপনি ভদ্রভাবে হানাফী মাজহাবের কোনো একটি মতকে হাদীসের মানদন্ডে ভুল হিসেবেও আখ্যায়িত করতে পারেন। যেহেতু কোনো মানুষই ভুলের উর্ধে নয়। কিন্তু তাই বলে, মাজহাবী ওলামায়ে কিরামকে মিথ্যাবাদী, পাপাচারী, খায়েশাতের অনুসারী ইত্যাদি সুমিষ্ট ভাষায় গালীগালাজ করতে পারেন না। এভাবে গালি-গালাজ শুরু করলে শেষ পর্যন্ত আপনাকে সাহাবায়ে কিরামকেও গালি-গালাজ করতে হতে পারে। যেহেতু হানাফী মাজহাব বা অন্যান্য মাজহাবের মতামতের স্বপক্ষে সাধারণত কোনো না কোনো সাহাবার আমল পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে মতাপার্থক্য চলে আসছে। পূর্ববর্তী ওলমায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন। তারা একেকজন একেক মত গ্রহণ করেছেন কিন্তু একজন আরেকজনকে নিন্দা-মন্দ করেন নি। গোমরাহ,

বিদয়াতী বা কাফির-মুশরিক হিসেবেও চিহ্নিত করেননি। বরং তারা একে অপরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন। আমরা দেখি, চার মাজহাবের আলেমরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে শত্রু ভাবেন না বরং বন্ধু ভাবেন। যেহেতু তারা জানেন উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। হয়তো আমার নিকট একটি বিষয় সঠিক মনে হচ্ছে কিন্তু আরেক জনের নিকট ভিন্ন একটি বিষয় সঠিক মনে হতে পারে। যেসব ব্যাপারে এ ধরণের সম্ভাবনা থাকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ এসব ব্যাপারে কোনো দলকে তিরস্কার না করার সুন্নাত আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি উপরে আমরা বর্ণনা করেছি।

তায়াম্মুমের বিধান

এরপর প্রফেসর সাহেব তার অমর গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠাতে তায়াম্মুমের বিধান সম্পর্কে মূল্যবান বয়ান শুরু করেন। হিদায়ার কিতাবে মাটি ছাড়াও বালু, পাথর, সুরকী, চুন ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ বলা হয়েছে দেখে তার মাথা গরম হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে" [মায়েদা/৬] আল্লাহর রাসুল মাটিতে হাত মারলেন এবং তার চেহারা

ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন – (বুখারীর বিভিন্ন হাদীস)

এরপর তিনি বলেন, “আল্লাহর নবী যা বললেন না অন্য কেউ কি তার উপর বৃদ্ধি করার এখতিয়ার রাখেন?” শেষে তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, এরকম খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে কিয়াস করলে রসুলের শরীয়ত অক্ষত টিকে থাকতে পারবে না।

উপরে আমরা দেখেছি প্রফেসর সাহেব হাদীস বানিয়ে বলেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতও নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে” প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কুরআনের কোথাও মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়নি। উক্ত আয়াতে ত্বীন (طين) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি বরং সয়ীদ (صعيد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

লিসানুল আরবে ইবনে মানযুর বলেন,

وَقَالَ أَبو إِسحاق: الصعيد وجه الأَرض. قال: وَعَلَى الإِنسان أَن يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ وَجْهَ الأَرضِ وَلا يُبَالِيَ أَكان فِي الْمَوْضِع تراب أَوَ لَمْ يَكُنْ لأَن الصَّعِيدَ لَيْسَ هُوَ التراب، إِنما هُوَ وَجْهُ الأَرض، تُرابًا كانَ أَو غَيْرِه. قالَ: وَلَوْ أَن أَرضًا كَانَتْ كُلُّهَا صَخْرًا لا تُرَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْمُتَيَمِّمُ يدَه عَلَى ذَلِكَ الصَّخْرِ لَكَانَ ذَلِكَ طَهُوراً

আবু ইসহাক বলেছেন, সয়ীদ (صعيد) হলো, ভূপৃষ্ঠ।

তিনি বলেন, মানুষের দায়িত্ব হলো, ভুপৃষ্ঠের উপর হাত মেরে (তায়াম্মুম করা)। এটা লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই যে, তার হাত যেখানে পড়ছে সেখানে মাটি আছে কি নেই। কেননা সয়ীদ মানে কেবল মাটি নয় বরং সয়ীদ হলো ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ। তা মাটি হোক আর যাই হোক। তিনি আরও বলেন, যদি কোনো এলাকার পুরোটা পাথর হয় এবং সেখানে কোনো মাটি না থাকে আর তায়াম্মুমকারী সেই পাথরের উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করে তবে এটাই পবিত্রতা অর্জন বলে গণ্য হবে।

এরপর তিনি বলেন,

لَا أعلم بَيْنَ أهل اللُّغَةِ خِلَافًا فِيهِ أن الصَّعِيدَ وَجْهُ الأرض

ভাষাবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে আমি কোনো দ্বিমত জানি না যে সয়ীদ হলো ভূ-পৃষ্ঠ।

মোট কথা সয়ীদ শব্দটির অর্থগত ব্যাপকতার কারণেই ওলামায়ে কিরাম মাটি ছাড়াও অন্যান্য বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করার বৈধতা দিয়েছেন। কুরআনে সরাসরি মাটি উল্লেখ থাকলে এমনটি হতো না। এ বিষয়ে লম্বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু প্রফেসর সাহেব শব্দটিকে মাটি অনুবাদ করে এবং সেটাকে চুড়ান্ত জ্ঞান করে হেদায়ার গ্রন্থকারের ভুল ধরতে গিয়ে কতটা বোকামী

করেছেন তা অনুধাবন করে কিছুটা লজ্জা পেলেই আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

তাকবীর প্রসঙ্গ

১২ পৃষ্ঠায় প্রফেসর সাহেব তাকবীর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। হানাফী মাযহাবে আল্লাহু আকবার না বলে আর-রহমানু আকবার, আল্লাহু আ'জাম ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করলে সলাত হয়ে যাবে বলা হয়েছে। এর উপর আপত্তি করে তিনি বলেন,

"অথচ নাবী ﷺ এর আমাল কেবলমাত্র তাকবীরের উচ্চারণ যা বুখারী মুসলিমসহ সকল হাদীস গ্রন্থে মৌজুদ।"

এরপর তিনি বিষয়টিকে হাদীস পরিত্যাগ করে মনগড়া শরীয়তের দিকে মানুষকে আহ্বান করা হিসেবে গণ্য করেছেন।

প্রফেসর সাহেবদের একটা বিষয় ভাল মতো বুঝে নিতে হবে যে, তারা হাদীস কুরআনের অর্থ অনুধাবন এবং হাদীস কুরআন থেকে হুকুম-আহকাম ইস্তিখরাজ করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ অদক্ষ। এতক্ষণের আলোচনায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং অমুক হাদীসে অমুক কথা বলা হয়েছে অতএব অমুক

জিনিসটি ফরজ এধরণের মন্তব্য তাদের ক্ষেত্রে শোভা পায় না। কেননা অনেক সময় হাদীসে অনেক কিছু বলা হয় কিন্তু তা ফরজ হয় না। রসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু নিয়মিত করেছেন এ যুক্তিতেও বিষয়টি ফরজ হয়ে যায় না। কোনটি ফরজ আর কোনটি ফরজ নয় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে উসুলে ফিকাহর নিয়ম কানুন সম্পর্কে সুবিস্তারে জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। হাদীসের উসুল ছাড়া যেমন সহীহ ও যঈফ হাদীস বাছাই করা সম্ভব নয় একইভাবে ফিকাহর উসুল ছাড়া কোনটি সঠিক ফিকহ (বুঝ) আর কোনটি ভ্রান্ত ফিকহ তা বোঝা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের তথাকথিত আহলে হাদীস ও সালাফীরা হাদীসের উসুল মানেন কিন্তু ফিকাহর উসুল সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানেন না। প্রফেসর সাহেব তো উসুলে ফিকাহর নাম শুনেছেন কিনা সেটাও সন্দেহের বিষয়। তার গ্রন্থটির বেশিরভাগ স্থানে তিনি যেসব আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার বেশিরভাগই আসলে উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। সেসব অভিযোগের জবাব দিতে হলে উসুলে ফিকাহর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব

নয়। সংক্ষেপে শুধু একটি বিষয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবো।

প্রফেসর সাহেব বিভিন্ন স্থানে বলেছেন অমুক হাদীসে অমুক কথা বলা হয়েছে বা অমুক কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতএব তা ফরজ। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে যাদের পড়াশুনা খুবই কম তারা এভাবে চিন্তা করে। তারা বলে, রাসুল যা কিছু করেছেন বা বলেছেন এবং পবিত্র কুরআনে যা কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবই ফরজ। সেগুলোর বাইরে আমল করা পাপের কাজ। যেসব ওলামায়ে কিরাম পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর অত্যাধিক পড়াশুনা করেছেন তারা লক্ষ্য করেছেন কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে বা যা কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার সব ফরজ নয়। একইভাবে যা কিছু থেকে নিষেধ করা হয়েছে তার সবই হারাম নয়। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } [الجمعة: ١٠]

যখন সলাত শেষ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করো। [জুমুয়া/১০]

আয়াতটি জুময়ার সলাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখানে জুময়ার সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রিযিক অন্বেষণের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এই নির্দেশ মান্য করা কি ফরজ? যদি কেউ জুময়ার সালাত শেষ হলে বাড়ি যেয়ে ঘুমায় বা মসজিদে বসে কুরআন তেলোয়াত করে সে কি গোনাহগার হবে?

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}

হে ঈমানদাররা তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকীতে লেল-দেন করো তখন তা লিখে রাখো। [বাকারা/২৮২]

এই আয়াতে বাকী লেন-দেনের সময় লিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা কি ফরজ? যদি কেউ না লেখে সে কি গোনাহগার হবে?

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [المائدة: ٢]

যখন তোমরা হজ্জের ইহরাম ভেঙে ফেল তখন শিকার করো। [মায়েদা/২]

এই আয়াত অনুযায়ী ইহরাম ভাঙার সাথে সাথে জঙ্গলে চলে যাওয়া ফরজ হবে কি?

আসল কথা হলো, কুরআন বা হাদীসে কোনো কিছুর নির্দেশ দিলেই তা ফরজ হয়ে যায় এমন নয় বরং অনেক সময় বিষয়টি বৈধ বোঝায়। আবার কখনও কখনও সুন্নাত বা মুস্তাহাব তথা করা উত্তম তবে না করলে সমস্যা নেই এমন বোঝায়।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, একবার সাহাবারা ইহরাম ভেঙে ফেললে রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ

তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও।

ইমাম বুখারী জাবির ﷺ হতে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই আদেশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ

(এই আদেশের মাধ্যমে) বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়নি বরং পুরুষদের জন্য স্ত্রীদের বৈধ করা হয়েছে। [৯]

আল্লাহর রসুলের সাহাবিয়্যাহ্ উম্মে আতীয়্যা (রাঃ) বলেন,

نهيما عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

[৯] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ১০, পৃষ্ঠাঃ ৫২৫, হাঃ ৬৮৬১।

আমাদের (মেয়েদের) জানাযার (মৃতদেহের) পিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে তবে এটা হারাম করা হয়নি। [১০]

অর্থাৎ অনেক সময় কোনো কিছু হতে নিষেধ করা হয় কিন্তু এর মাধ্যমে হারাম করা উদ্দেশ্য হয় না তবে উক্ত কাজটি পরিত্যাগ করা উত্তম এমন উদ্দেশ্য হয়।

দেখা যাচ্ছে নির্দেশ দিলেই সব কিছু ফরজ হয়ে যায় না এবং নিষেধ করলেই হারাম হয়ে যায় না এ বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামও জানতেন ও মানতেন। সুতরাং কেবল একটি আয়াত বা হাদীস পেশ করে অমুক কাজ ফরজ বা অমুক কাজ হারাম এমন মন্তব্য করলেই হবে না বরং উক্ত আয়াত ও হাদীসের অর্থ কি সেটা অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হতে হলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু রসুলের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারাই এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

উপরে আমরা উসুলে ফিকহের অসংখ্য নিয়ম-নীতির মধ্যে একটি মূলনীতি সম্পর্কে অতি সামান্য আলোচনা

---

[১০] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ২, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৪, হাঃ ১২০৪।

পেশ করলাম। এ বিষয়ে আমরা "মাজহাব বনাম আহলে হাদীস" নামক কিতাবে কিছুটা বিস্তারিত আর "নাফউল ফারীদ" নামক গ্রন্থে সুবিস্তারে আলোচনা করেছি।

যাই হোক, সলাতের শুরুতে রসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ আকবার বলে তাকবীর দিয়েছেন এটা সবাই জানে, সলাতের শুরুতে তাকবীর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাও সবার জানা। একারণে সকল মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সলাতের শুরুতে আল্লাহু আকবার বলাই অধিক সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু "আল্লাহু আকবার" বলাই ফরজ কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আমি পূর্বেই বলেছি হাদীসে কিছু উল্লেখ থাকলেই তা ফরজ হয়ে যায় না বরং কোনো কিছুকে ফরজ প্রমাণ করতে হলে বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। হানাফী ওলামায়ে কিরাম বলেছেন সলাতে আল্লাহু আকবার বলাই উচিৎ তবে এটা ফরজ নয় বরং যে কোনো ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে সলাত শুরু করাই যথেষ্ট হবে। যেহেতু আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥]

আল্লাহর নাম স্মরণ করে সলাত আদায় করে।

এই আয়াতে সলাতের শুরুতে যে কোনোভাবে আল্লাহর যিকির করা তথা আল্লাহর নাম স্মরণ করাই যথেষ্ট এমন প্রমাণিত হয়। এখন হানাফী ওলামায়ে কিরাম এই আয়াতটি ও উপরোক্ত হাদীসের সাথে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন, আয়াতে যা বলা হয়েছে ততটুকু আদায় করা যথেষ্ট হবে কিন্তু হাদীসে পরিপূর্ণ সওয়াব কিসে হবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। এখন যে "আল্লাহ আকবার" বলে সলাত শুরু করবে তার সওয়াব হবে অধিক আর অন্য কোনো ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করলে তাতে এই অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যাবে না তবে সলাত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ ওযুর সময় চারটি অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করা, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে যোগ করেছেন। এছাড়া ওযুর অঙ্গ সমূহ তিন বার করে ধৌত করেছেন। এসব বিষয় হাদীসে উল্লেখ আছে, তবু এগুলো কিন্তু ফরজ হয়ে যায় নি। বরং এগুলো সুন্নাত। যদি কেউ এগুলো আদায় করে পরিপূর্ণভাবে ওযু করে তবে অধিক সওয়াব হবে কিন্তু যদি কেউ এগুলো আদায় না করে বরং কেবল আয়াতে উল্লেখিত চারটি অংগ ধৌত ও

মাসেহ করে তবে তার সওয়াব কম হবে কিন্তু ওযু হয়ে যাবে।

প্রফেসর সাহেবরা বলেন, হেদায়াতে যেহেতু বলা হচ্ছে "আল্লাহু আকবার" না বলে যে কোনো যিকির করলেই যথেষ্ট হবে তাহলে হানাফী ভাইরা এমন করে না কেনো? এসব গাধারা এটা উপলব্ধি করে না যে, হানাফীরা "আল্লাহু আকবার" বাদ দিয়ে অন্য কোনোভাবে যিকির করা যথেষ্ট বলে কিন্তু "আল্লাহ আকবার" বলাকেই উত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অতএব তারা এটা পরিত্যাগ করবে কেনো? আহলে হাদীসরাও তো কেবল ফরজ সলাত আদায় করা যথেষ্ট বলে তবু সুন্নাত বা নফল সলাত কেনো পড়ে?

এখন বিচক্ষণ পাঠক চিন্তা করে দেখুন হানাফী ওলামায়ে কিরাম হাদীসকে অবমাননা করেছেন দাবীটি কি সঠিক নাকি তারা আসলে হাদীস ও কুরআনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন? তাদের এই ব্যাখ্যা আপনি মানেন বা না মানেন সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু হানাফী আলেমরা হাদীসবিরোধী ও শিরক-কুফরে লিপ্ত একথা বলার কোনো সুযোগ আছে কি? যারা এ ধরণের মন্তব্য করে কাল কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেবে?

ফারসী ভাষায় কুরআন তেলোয়াত করা

১২ নং ও ১৩ নং পৃষ্ঠায় প্রফেসর সাহেব হিদায়ার গ্রন্থকারের উপর একটি অপবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিদায়াতে সলাতের মধ্যে ফারসী ভাষায় কুরআন পাঠ করার দলীল রয়েছে। অতএব হানাফী ভাইদের উচিৎ ফারসী ও অন্যান্য অনারবী ভাষায় কিরাত পাঠ করে সলাত আদায় করা।

অথচ হেদায়ার গ্রন্থকার কিন্তু মোটেও এমন কথা বলেননি। তিনি কেবল, সলাতের মধ্যে ফার্সী ভাষায় তেলোয়াত ও যিকির বৈধ হওয়ার পক্ষে ইমাম আবু হানিফা ﵀ মত দিয়েছেন বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে তার ছাত্ররা তার বিপক্ষে মত দিয়েছেন এটা উল্লেখের পর তিনি বলেন,

ويروي رجوعه في اصل المسألة الي قولهما وعليه الاعتماد

এমন বর্ণিত আছে যে, এ বিষয়ে ইমাম সাহেব নিজের মত পরিত্যাগ করে তার ছাত্রদের মত মেনে নিয়েছেন। এটির (সলাতে ফার্সী ভাষায় কুরআন তেলোয়াত বৈধ না হওয়ার মতটি) উপরই নির্ভর করতে হবে।

[মুল আওয়ালাইন-১০২, ইঃফাঃ ১ম খন্ড/৭৮]

ক্বওমী মাদ্রাসাতে যে আরবী হিদায়া পড়ানো হয় তাতে

এ বিষয়ে ইমাম সাহেবের মতটি বর্জন করার কারণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে,

لأن ما قاله يخالف كتاب الله ظاهرا حيث وصف القرآن بالعربي

কারণ তিনি (ইমাম সাহেব) যা বলেছেন তা বাহ্যিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিপরীত যেহেতু পবিত্র কুরআনকে "আরবী" হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে (অতএব, সলাতে আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলোয়াত করা বৈধ হবে না)।

হিদায়ার অনুবাদক নিজেও টিকা আকারে এই মন্তব্যটি অনুবাদ করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। [১১]

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় হানাফী ওলামায়ে কিরাম কুরআনের বিপরীতে গেলে তাদের ইমামের মতও বর্জন করতে প্রস্তুত আছেন। ফলে প্রফেসর সাহেব এ যাবৎ হানাফী ওলামায়ে কিরামের উপর হাদীস বিরোধী, খেয়াল খুশির অনুসারী ইত্যাদি যেসব আপত্তি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বোধ হয় একারণেই প্রফেসর সাহেব শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছেন। মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্লেখ না করে

[১১] এতকিছুর পরও প্রফেসর সাহেব বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেন নি। কথায় বলে, চোরা না শোনে ধর্মের বুলি।

সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলেছেন, হিদায়ার গ্রন্থকার ফার্সী ভাষায় কুরআন তেলোয়াত করার অমুনতি প্রদান করেছেন।

হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি সকল মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম ভালভাবেই অবগত আছেন যে, নবী-রাসুল ছাড়া আর কেউ মা'সুম বা নির্ভুল ও নিষ্পাপ নহেন। আরবী প্রবাদে বলে,

لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم هفوة

উৎকৃষ্ট ঘোড়াও হোচট খায় আর দক্ষ আলেমেরও ভুল হয়।

তাই যদি কখনও কোনো আলেমের কথা ইলমী মানদন্ডে ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আমি বলেছি ইলমী মানদন্ডে এর অর্থ হলো, যারা শরয়ী ইলমের মূলনীতি সম্পর্কে অবগত ও দক্ষ কেবল তারাই এটা বিচার করতে সক্ষম। অজ্ঞ ও মুর্খ লোকদের ইচ্ছানুযায়ী নয়। অনেকে বলতে পারে, মুজহাহিদ ইমামদের ভুল হতে পারে আমাদেরও ভুল হতে পারে তাহলে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে আমরাও মন্তব্য করবো। এর উত্তর হলো অভিজ্ঞ ড্রাইভারও দূর্ঘটনা ঘটায় আবার অনভিজ্ঞ ড্রাইভারও দুর্ঘটনা ঘটায় এই যুক্তিতে কি অনভিজ্ঞ ড্রাইভারকে

রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দেওয়া যায়? এরকম ঢালাওভাবে লাইসেন্স দিলে দেশে জীবিত মানুষ কি একটিও টিকে থাকবে? সুতরাং মুজতাহিদ ইমামরা কোনো বিষয়ে ভুল করে থাকলে সে কারণে তাদের অসম্মান বা তিরস্কার করা কখনও বৈধ নয়। মুজতাহিদ যখন ইজতিহাদ করে তখন তার রায় ভুল হলে একটি এবং ঠিক হলে দুটি সওয়াব হয় বলে সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে আবু দাউদে মুয়াজ ইবনে জাবাল থেকে মাওকুফভাবে চমৎকার একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটির মূল ভাব হলো, মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেন, তোমরা আলেমের ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকবে তবে একারণে তাকে পরিত্যাগ করবে না। বাস্তবতা হলো কোনো আলেমই ভুলের উর্ধ্বে নয় এমন কি সাহাবায়ে কিরামও অনেক সময় ভুল রায় দিয়েছেন। উমর ﷺ তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে, ইবনে মাসউদ ﷺ তায়াম্মুম সম্পর্কে, আবু যার ﷺ যাকাত সম্পর্কে, ইবনে আব্বাস ﷺ মুতয়া বিবাহ সম্পর্কে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞ সাহাবায়ে কিরাম এমন মতামত দিয়েছেন যা পরবর্তীতে সুস্পষ্ট ভুল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একারণে কি তাদের তিরস্কার করা যাবে নাকি তারাও ভুল করেছেন এই যুক্তিতে

তারা অন্যান্য যেসব হাদীস ও মতামত বর্ণনা করেছেন তা পরিত্যাগ করতে হবে? যে বলে হেদায়ার গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফার উক্ত মত বর্ণনা করেছেন অতএব, তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কীভাবে হবে? তাকে বলি সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও সাহাবায়ে কিরামের ঐ সকল মতামত বর্ণনা করা হয়েছে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এখানে সেসব ঘটনার বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উল্লেখ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাছাড়া হেদায়া বিরোধীরা তো বুখারী-মুসলিম প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছেন। আশা করি এসব দলীল প্রমাণ নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবেন। যদি তাও না পারেন তবে পরবর্তীতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো। যাই হোক, সাহাবায়ে কিরামের এই সকল ভুল মতামত উল্লেখ করার কারণে বুখারী বা মুসলিম কি অনির্ভরযোগ্য কিতাব বলে গণ্য হবে? তা যদি না হয় তবে হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফার একটি মত উল্লেখ করেছেন এবং সেটাকে বর্জন করার কথাও বলেছেন তবু তার কিতাবকে অনির্ভরযোগ্য কেনো বলছেন?

এরপর প্রফেসর সাহেব বিবাহ-তালাক, রুকু-সাজাদা, হাত বাধা, সুরা ফাতিহা পাঠ করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে

কানার মতো হাত-পা ছড়িয়ে আলোচনা করেছেন। সেসব ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব দিতে গেলে কয়েক'শ পৃষ্ঠার বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করতে হবে যা করার ইচ্ছা বা সময় কোনোটিই আমার হাতে নেই। তাছাড়া এরকম নিরেট বোকার সাথে খুব বেশিক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যাওয়াটাও বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। হয়তো পাঠকরাও এতে বিরক্ত হবেন। এই গ্রন্থে কেবল এতটুকু প্রমাণ করাই যথেষ্ট যে, হেদায়ার ভুল ধরতে এসে পন্ডিত সাহেব প্রতি পদে পদে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তিনি হিদায়া কিতাবের বিশাল দুইটি ভলিয়ম ঘেটে ঘেটে ৫০ পৃষ্ঠার মতো একটি বই রচনা করেছেন। তাতে তিনি কিছু ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন যা আসলে তার বোঝার ভুল যেমনটি আমরা প্রমাণ করেছি। আর আমরা প্রফেসর সাহেবের ৫০ পৃষ্ঠার চটি বইটির ৮-১৩ পৃষ্ঠার মধ্যে অর্থাৎ মাত্র ৬ টি পৃষ্ঠার মধ্যে অগণিত ও অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি রয়েছে বলে প্রমাণ করেছি। কেবল ভুল-ভ্রান্তি নয় বরং হাদীস তৈরী করা এবং কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করার মতো ঘৃণিত অপরাধও আমরা খুঁজে পেয়েছি। একারণে আমি সম্পূর্ণ বইটির উপর আলোচনা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। এখন বইটির বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখকের

ভন্ডামী ও ধোকাবাজীর কিছু প্রমাণ পেশ করবো। যাতে নিরপেক্ষ মানসিকতা সম্পন্ন যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন এধরণের অশিক্ষিত [১২] প্রফেসরদের নিকট দ্বীন শিখতে গেলে কি ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে।

স্বীয় গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় প্রফেসর সাহেব কোনো যিম্মী কাফির যদি শরাব ও শুকর নিয়ে অতিক্রম করে তবে শরাব বা শুকরের উপর উশর আদায় করার বিধানটি উল্লেখ করে হারাম বস্তুর উপর উশর আদায়ের ব্যাপারটিকে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখিত উদ্ধৃতিটি পাঠ করে যে কেউ বিষয়টিকে আপত্তিজনক মনে করতে পারে। আসলে প্রফেসর সাহেব এখানে একটি চালাকী খাটিয়েছেন। মুল হিদায়া গ্রন্থের বক্তব্য থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন যাতে পাঠক ধোঁকায় পড়ে যায়। সেই অংশটি হলো,

قوله عشر الخمر أي من قيمتها

"শরাবের ওশর গ্রহণের অর্থ হলো তার মূল্যের উপর ওশর গ্রহণ করা"

[মুল আওয়ালাইন-১৯৭ ইঃফাঃ ২০৭]

এই অংশটুকু বাদ দেওয়ার কারণে পাঠক মনে করতে

---

[১২] দ্বীনী জ্ঞানের দিক থেকে।

পারে হানাফী মাজহাবের আলেমরা ওশর হিসেবে সরাসরি মদ গ্রহণ করতে বলছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হলো এখানে মদের মূল্য হিসাব করে মূল্য গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। এখন কেউ বলতে পারে মদ বা শুকর তো হারাম। এসবের মূল্য থেকেই বা কীভাবে ওশর আদায় করা হচ্ছে? এর উত্তর হলো এখানে যে ওশর আদায় করা হচ্ছে তা আসলে শুল্ক বা ট্যাক্স। বিভিন্ন পণ্যের উপর রাষ্ট্র যে শুল্ক আদায় করে এখানে সে সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। মদ বা শুকর আল্লাহ হারাম করেছেন এটা তো অবশ্যই ঠিক। একইভাবে শিরক-কুফরও হারাম। সকল মুসলিমই এটা জানে। কিন্তু সেই সাথে এটাও জানতে হবে যে, এসব বিষয় হারাম হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসরত যিম্মী কাফিরদের জিজিয়ার বিনিময়ে কিছু শর্ত সাপেক্ষে নিজেদের ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হবে। সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত এবং তার তাফসীর পাঠ করলেই এসব ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যাবে। আশা করি প্রফেসর সাহেব অন্যান্য সব বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিলেও এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত আছেন। যেহেতু আধুনা মানসিকতার লোকেরা বি-ধর্মীদের অধিকার নিয়ে একটু বেশীই সচেতন। যাই হোক, জিজিয়ার অর্থ

হলো, অমুসলিমদের নিকট বাৎসরিক কর গ্রহণ করে শর্তসাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া। সে হিসেবে মদ পান করা, শুকর পালন করা বা নিজেদের মধ্যে এসব হারাম পণ্য বেচা-কেনা করার অনুমতিও তারা পাবে। কোনো মুসলিম এটা করলে নিষেধ করা হবে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী কাফিররা এগুলো করলে তাদের বাধা দেওয়া হবে না। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব পন্য টিকে থাকার বৈধতা পাবে তার মধ্যে যিম্মী কাফিরদের মদ ও শুকরও রয়েছে। এখন শুল্ক গ্রহণ করার সময় যদি কেবল দুধ, মধু ইত্যাদি বৈধ পণ্যের শুল্ক গ্রহণ করা হয় আর মদ কে বিনা শুল্কে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে মদের প্রচার-প্রসারে সহযোগীতা করা বলে গণ্য নয় কি? বরং বুদ্ধির দাবী হলো সম্ভব হলে মদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করা যাতে আস্তে আস্তে মদের ব্যবসায়ীরা ব্যাবসা পরিত্যাগ করে। সুতরাং মদ বা শুকরের মূল্যের উপর শুল্ক গ্রহণ করাটা মদকে হালাল করা নয় বরং এগুলোকে বাধাগ্রস্ত করা হিসেবে গণ্য। কিন্তু নির্বোধরা তা বুঝতে সক্ষম নয়।

মুতয়া বিবাহ ও মোহরানা

স্বীয় গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় প্রফেসর সাহেব সাময়িক বিবাহ তথা নিকাহে মুতয়া এবং বিবাহে মোহর প্রদান করা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। ২৭ থেকে ৩১ পর্যন্ত মোট পাঁচটি পৃষ্ঠাতে এ সম্পর্কে তিনি বেশ লম্বা আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি হানাফী ওলামায়ে কিরাম বিশেষত ইমাম যুফারের উপর মুতয়া বিবাহ বৈধ করার অপবাদ দিয়েছেন। তারপর মোহর সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তিনি বহু সংখ্যক ভুল-ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন,

"যেমন কেউ দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দশ দিনের জন্য বিবাহ করলো ইমাম যুফার (রহ:) বলেন, বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে তা স্থায়ী হয়ে যাবে। ইমাম যুফার হানাফী মাজহাবের একজন উঁচু দরের ১ম সারির ইমাম। তাঁর বক্তব্যে সাময়িক বিবাহ জায়িয হয়ে গেলো। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ খাইবার বিজয়ের পর মুতআ বা সাময়িক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর তিনি সহীহ বুখারীর বিভিন্ন স্থান থেকে হাদীসটির দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত তিনি এখানে কারচুপি করেছেন। হিদায়ার গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উল্লেখ না করে সুবিধা মতো কাটিং করেছেন। হিদায়ার মূল বক্তব্যটি হলো,

والنكاح الموقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام وقال زفر هو صحيح لأزم لان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة

সাময়িক বিবাহ অগ্রহণযোগ্য। যেমন কেউ হয়তো দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে একজন মহিলাকে দশ দিনের জন্য বিবাহ করলো। তবে ইমাম যুফার বলেছেন, এই বিবাহ সঠিক হবে এবং স্থায়ী হয়ে যাবে। কেননা অগ্রহণযোগ্য শর্ত মূল বিবাহকে বাতিল করে না। (মূল আওয়ালাইন-২১৩ ইঃফাঃ ২য় খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা)

এরপর হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম যুফারের মতটির বিরোধিতা করে বলেন,

ولنا أنه آتي بمعني المتعة

ইমাম যুফারের বিপরীতে আমাদের দলীল হলো, সে মুতয়া বিবাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করেছে।

এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হয় যে, হানাফী ওলামায়ে কিরাম ইমাম যুফারের মতো উঁচু দরের ১ম সারির ইমামকেও অন্ধ অনুসরণ করেন না। অথচ আহলে হাদীসরা দ্বীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞ ও মুর্খদের

অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। এমন অনেক আহলে হাদীস বা সালাফী ভাই রয়েছেন যারা প্রফেসর সাহেবের এই বইটি পাঠ করে অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করে হিদায়া কিতাব সম্পর্কে ভুল ধারণায় পতিত হয়েছেন। একবারও নিজেরা হিদায়া কিতাবটি খুলে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি। তাহলে হয়তো আমাকে কষ্ট করে এত কথা লিখতে হতো না। যাই হোক, হিদায়ার গ্রন্থকার ইমাম যুফারের একটি মত বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা গ্রহণ করেননি। একারণে তাকে তিরস্কার করা একটা জুলুম, তার চেয়েও বড় জুলুম হলো ইমাম যুফারের কথায় সাময়িক বিবাহ বৈধ করা হয়েছে বলে দাবী করা। ইমাম যুফার বলেছেন দশ দিন টিকে থাকার শর্তে বিবাহ করলে উক্ত শর্ত বাতিল কিন্তু বিবাহ হয়ে যাবে এবং তা স্থায়ী হয়ে যাবে। বিবাহ যে স্থায়ী হয়ে যাবে সেটা প্রফেসর সাহেবও উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হলো, যে বিয়ে স্থায়ী হয়ে যায় তাকে কি সাময়িক বিবাহ বলা যায়? স্থায়ী আর সাময়িক কি এক জিনিস? এখন দেখছি প্রফেসর সাহেব বাংলা ভাষাও বোঝেন না। হিদায়ার গ্রন্থকার নিজে ইমাম যুফারের মতটিকে গ্রহণ না করা সত্বেও তিনি বিষয়টিকে সাময়িক বিবাহ তথা মুতয়া বিবাহ বলে গণ্য

করেননি বরং বলেছেন এর সাথে মুতয়া বিবাহের সাদৃশ্য রয়েছে। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাপারে তিনি কত বেশি অবহিত ছিলেন! যাই হোক, ইমাম যুফারের পক্ষে যুক্তি হলো, অগ্রহণযোগ্য শর্তের কারণে বিবাহ বাতিল হয় না বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যায়। তার এই যুক্তির স্বপক্ষে কিন্তু সরাসরি আল্লাহর রাসুলের হাদীস পাওয়া যায় যা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। হিদায়ার পিছনে লাগতে গিয়ে প্রফেসর সাহেব হয়তো বুখারী-মুসলিমই পড়ে শেষ করতে পারেননি। তাই হাদীসটি সম্পর্কে জানতে পারেননি।

উক্ত হাদীস বলা হয়েছে মা আয়েশা ﵂ একটি দাসীকে ক্রয় করে মুক্ত করার ইচ্ছা করলে দাসীটির মালিক মুক্ত করার পর দাসীটির ওয়ালা (কর্তৃত্ব) দাবী করে। কিন্তু ইসলামের বিধান হলো, যে মুক্ত করে ওয়ালা তার হয়। রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বলেন,

خُذِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ঠিক আছে, ওয়ালা তার মালিকের হবে এই শর্তেই তুমি দাসীটি ক্রয় করো। কেননা ওয়ালা হবে তার যে মুক্ত করে। (অর্থাৎ এই শর্তে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, ওয়ালা তোমারই হবে।)

এরপর তিনি জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন,

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

শরীয়ত বিরোধী যে কোনো শর্ত অগ্রহণযোগ্য, যদিও একশ শর্ত হয়। (১৩)

এই হাদীস প্রমাণ করে যখন কোনো চুক্তিতে একটি পক্ষ অগ্রহণযোগ্য শর্ত আরোপ করে তখন মূল চুক্তিটি সম্পাদিত হয়ে যায় আর শর্তটি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম যুফারের মতামতটি হাদীস বিরোধী নয়। তবে মুতয়া বিবাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে হিদায়ার গ্রন্থকার মতটি গ্রহণ করেননি। হারামের রাস্তা বন্ধ করার ব্যাপারে তিনি কতটা তৎপর ছিলেন তা পাঠক সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। আর তাকেই কিনা হারামকে হালাল করার অপবাদ দেওয়া হচ্ছে! এটা খারেজীদের বদ অভ্যাস, যা বর্তমান যুগের অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের মস্তিস্কে দৃঢ়ভাবে স্থান গেড়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

এরপর প্রফেসর সাহেব স্ত্রীদের মোহরানা প্রদান করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মোহরানাকে দেনমহর বলার বিপক্ষে কিছুক্ষণ যাচ্ছেতাই বকবক করেছেন।

---

(১৩) বুখারী ইঃফাঃ খন্ড ৪, পৃষ্ঠাঃ ৬২, হাঃ ২০৩৪।

বলেছেন, "দেন হলো আরবী দায়েন শব্দের বিকৃতরূপ। দায়েন শব্দের অর্থ ঋণ" এরপর সূরা বাকারারঃ ২৮২ নং আয়াতটি উল্লেখ করে দায়েন মানে যে ঋণ তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এরপর স্বভাবসূলভ বোকামী বশতঃ বলেন,

"আল্লাহ বললেন মহর পরিশোধ করো বাকি রেখ না। আর গাইরুল্লাহ ঐ মহরটাকে ঋণ শব্দের সাথে জুড়ে দিয়ে মহরকে অপরিশোধযোগ্য বলে চালু করে দিলো। অথচ আল্লাহর বান্দা হওয়া স্বত্ত্বেও গাইরুল্লাহর শব্দটা বয়ে বেড়ানো এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তন করা তা কি ধরণের ও কি পরিমাণের গুনাহ সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছে?

[পৃষ্ঠা-২৮]

এরপর তিনি বলেন,

"আল্লাহর বিধান স্ত্রীকে মহর প্রদান করা এবং কোনক্রমেই তা ঋণের বা দেনার পর্যায়ভূক্ত না করা। যদি সত্যই এটা দেনার পর্যায়ভুক্ত করা যেতো তবে আল্লাহ তার কালামেই দায়েন শব্দটা ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাহলে কোন অধিকারে ঐ বিধানকে সংশোধন করা হলো? এর এখতিয়ার তাকে কে দিল?"

[পৃষ্ঠা-৩০]

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "সাধারন মানুষের জন্য মহর প্রদান যেমন ফারয তেমনি মহানবী ﷺ কেও বিবাহের মহর প্রদান করতে হয়েছে। তাকেও মহর প্রদান হতে অব্যহতি দেওয়া হয় নি। যেমন আল-কুরআনে ঘোষণা করছে-

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب: ٥٠]

হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মহর তুমি প্রদান করেছ। [আহযাব/৫০]

এরপর আলোচনার শেষে তিনি মন্তব্য করে বলেছেন মহর যে বাকী রাখা যাবে না সেটা নাকি উপরোক্ত আলোচনাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং মোহরানা বাকী রাখার ব্যাপারে নাকি কোনো সহীহ হাদীস নেই।

এখানে লম্বা আলোচনা করবো না কেবল একটি হাদীস উল্লেখ করবো যাতে মোহর বাকী রাখার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। হাদীসটি প্রফেসর সাহেব নিজেই তার গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু বুঝে উঠতে পারেননি। আমি ধরিয়ে দেওয়ার পরও বুঝবেন কিনা তা নিয়ে

সন্দেহ রয়েছে কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় বুঝবেন। হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। হাদীসটি হলো, একজন ব্যক্তি একজন মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে মোহর হিসেবে কিছু হাজির করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে সে কিছুই হাজির করতে সক্ষম না হলে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

তোমার সাথে যতটুকু কুরআন আছে (তা শিখিয়ে দেওয়ার শর্তে) আমি তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম। [১৪]

লক্ষণীয় হলো, বিবাহ তখনই হয়ে গেলো কিন্তু কুরআন শেখানো কি তখনই সম্পন্ন করা হলো না কি পরে? এটা বাকী হলো না নগদ? আশা করি পাঠক ভেবে দেখবেন।

তাছাড়া পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে,

{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٦]

যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই বা

[১৪] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড-৪, পৃষ্ঠাঃ ১৫৬, হাঃ ২১৬১।

তাদের মোহরানা নির্ধারণের পূর্বেই তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করো তবে তাতে সমস্যা নেই। সেক্ষত্রে ধনী তার সামর্থ অনুযায়ী এবং গরীব তার সামর্থ অনুযায়ী ইনসাফ করে কিছু সম্পদ দিয়ে দাও। [বাকারা/২৩৬]

এই আয়াত প্রমাণ করে মোহরানা পরিশোধ তো নয়ই এমন কি মোহরানা কত তা নির্ধারণ না করেই বিবাহ করা যায়। মোহরানা নির্ধারণ না করা হলে ঐ মেয়ের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে কিয়াস করে ইনসাফ অনুযায়ী পরবর্তীতে তা নির্ধারণ করে নেওয়া যায়। এই বিষয়টিকে বলা হয় মোহরে মেছেল।

প্রফেসর সাহেব বলেছেন, রসুলুল্লাহ ﷺ কে মোহর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]

এবং সেই নারী আপনার জন্য বৈধ যে আপনার নিকট নিজেকে (কোনো বিনিময় ছাড়াই) সপে দেয় যদি আপনি তাকে বিয়ে করতে চান। এটা কেবল আপনার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য মুমিনদের ক্ষেত্রে নয়। [আহযাব/৫০]

অর্থাৎ মোহরানা ছাড়াই কোনো নারীকে বিবাহ করা

বৈধ হওয়ার বিষয়টি কেবল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য মুমিনদের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু প্রফেসর সাহেব এ বিষয়ে রসুলের বিশেষ কোনো মর্যাদা আছে তা স্বীকার করেননি। এভাবে তিনি নিজেকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছেন। আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করার সুযোগ দিন।

অল্প বিদ্যা যে, কতটা ভয়ংকর হতে পারে আশা করি প্রফেসর সাহেবের এই মূল্যবান আলোচনা পাঠ করে পাঠক তা সবিস্তারে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

এরপর প্রফেসর সাহেব একটি জটিল মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন। হিদায়া কিতাবে লেখা আছে, কোন মুসলমান যদি মদ বা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়িয হবে।

এরপর প্রফেসর সাহেব বলেন, "মদ ও শুয়োর সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা, এটা হারাম।" তারপর এ বিষয়ে ডজন খানেক দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এনারা কেবল দলীল উল্লেখ করতেই পারেন। দলীলের অর্থও বোঝেন না, কোথায় দলীল উল্লেখ করতে হয় তাও জানেন না। মদ আর শূকর যে হারাম এটা কি কারও অজানা আছে, নাকি কেউ এটা অস্বীকার করেছে? এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উল্লেখ

করার কি প্রয়োজন সেটা পাঠকই চিন্তা করুন।

যাই হোক দলীল প্রমাণ উল্লেখের পর প্রফেসর সাহেব বলেন, যে হালালকে হারাম করে তাকে কি বলে? [উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা-৩২]

অর্থাৎ "মদ ও শূকরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদন করলে উক্ত বিয়ে হয়ে যাবে" এ ফতোয়া দেওয়ার মাধ্যমে হানাফী ওলামায়ে কিরাম হারামকে হালাল করে নিয়েছেন। এটাই হলো প্রফেসর সাহেবের বক্তব্য। অনেক পাঠকের নিকট বিষয়টি একটু জটিল মনে হবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃত ঘটনা হলো প্রফেসর সাহেব এখানেও চালাকীর আশ্রয় নিয়েছেন। হিদায়া গ্রন্থের সম্পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ না করে কাটিং করেছেন। সম্পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করলে বিষয়টির জটিলতা নিরসন হবে। হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الْخَمْرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ

কোনো মুসলমান যদি মদ ও শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে আর স্ত্রী মোহরে মেছেল পাবে। কেননা মোহররূপে মদ গ্রহণের শর্ত হলো শর্তে ফাসেদ (অগ্রহণযোগ্য শর্ত)। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে আর শর্ত নাকচ হয়ে যাবে। [মূল

আওয়ালাইন-৩৩১ ইঃফাঃ ২য় খন্ড-৪৮]

আশা করি এই সম্পুর্ণ ইবারতটি পাঠ করে পাঠকের মস্তিস্ক থেকে বিষয়টির জটিলতা অনেকাংশে দূর হবে। যেহেতু এখানে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে বিয়ের সকল নিয়ম-কানুন মানা হয়েছে কেবল মোহরানার ক্ষেত্রে মদ বা শূকরকে নির্ধারণ করা হয়েছে যা হারাম হওয়ার কারণে মুসলিমদের নিকট কোনো সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। অতএব, বিয়েটি কোনো গ্রহণযোগ্য দেনমোহর নির্ধারণ না করেই সম্পন্ন হয়েছে সুতরাং এর বিধান হবে ঐ বিয়ের মতো যাতে কোনো দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় না। সেক্ষেত্রে বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে কিন্তু মদ ও শূকরকে বাতিল করে অন্য কোনো বৈধ সম্পদ দ্বারা উক্ত মেয়েটির ইনসাফপূর্ণ মোহরানা আদায় করতে হবে। এই মোহরানাকেই মহরে মেছেল বলা হয়েছে।

এখন কি কারও নিকট মনে হবে হিদায়ার গ্রন্থকার হারামকে হালাল করেছেন? সম্ভবত প্রফেসর সাহেব "উক্ত বিয়ে জায়েজ হবে" এই কথাটি ভাল মতো বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন মদ বা শূকর মোহরানা হিসেবে গণ্য করা এবং এভাবে বিয়ে করা জায়েজ। আসলে জায়েজ শব্দটি আরবী ভাষায় কেবল

বৈধ অর্থে নয় বরং কার্যকরী হওয়া বা সম্পাদিত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এখানে বলা হচ্ছে বিয়ে সম্পাদিত হবে। এধরণের বিয়ের আয়োজন যারা করে তাদের কোনো পাপ হবে না এটা উদ্দেশ্য নয়। যেমন যদি কেউ বলে, যে বিয়ের অনুষ্ঠানে গান বাজনা ও নাচা-নাচি হয় উক্ত বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এটা উদ্দেশ্য নয় যে গান বাজনা করলে তাতে পাপ হবে না। বরং উদ্দেশ্য হলো এ কারণে বিয়ে বাতিল হবে না। আরবী সম্পর্কে দক্ষ না হওয়ার কারণে প্রফেসর সাহেব বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হাম্বলী মাজহাবের প্রখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ আল-মুগনীতে কিন্তু হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

إِذَا سَمَّى فِي النِّكَاحِ صَدَاقًا مُحَرَّمًا، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ

যদি বিয়েতে হারাম কোনো জিনিস মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে যেমন মদ বা শূকর তবে নির্ধারিত মোহর বাতিল হবে এবং বিবাহ সঠিক হবে। এ বিষয়ে ইমাম আহমদের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে এবং প্রায় সকল ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে মত দিয়েছেন। [আল-

মুগনী]

প্রফেসর সাহেবরা কি তবে এখন হাম্বলী মাজহাবের নিন্দা-মন্দ করা শুরু করবেন নাকি "আল-মুগনীতে এ কি কাহিনী" নামে একটি চটি বই রচনা করবেন? নাকি তাদের রাগ কেবল হানাফী মাজহাবের বিরুদ্ধে? হক-বাতিল যেভাবে হক হানাফী মাজহাবকে নিন্দা-মন্দ করাই তাদের কাজ। তবে পাহাড়ের সাথে তাল মারলে পাহাড় টলবে না বরং নিজের প্রাণটা যাবে।

এজন্য আমরা এসকল প্রফেসরদের উপদেশ দিয়ে বলব, "আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না"। আপনারা যার যোগ্য নন সে বিষয়ে মন্তব্য না করে যারা উক্ত বিষয়ের যোগ্য তাদের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দেওয়াই আপনাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

পরবর্তীতে অনুরূপ আরেকটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "কোনো যিম্মী যদি কোন মহিলাকে মদ বা শুয়োর এর বিনিময়ে বিবাহ করে অতঃপর উভয়ে কিংবা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে স্ত্রী মদ ও শুয়োর পাবে"

এতদূর উল্লেখ করে প্রফেসর সাহেব বলেন, "এ ফাতওয়ায় কি মদ ও শুয়োর হালাল করে দেওয়া হলো না?" এরপর তিনি আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ মেনে

চলতে হবে মর্মে কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে দিয়েছেন। [পৃষ্ঠা-৩২]

এই মাসয়ালাটি আগের মাসয়ালা অপেক্ষা বেশি জটিল। যেহেতু এখানে সরাসরি মদ ও শূকর পাবে বলা হচ্ছে। মদ বা শূকরের মূল্য নয়। অতএব, অনেকে মনে করতে পারেন, হিদায়ার গ্রন্থকার বলতে চাচ্ছেন, এই স্ত্রী লোকটি মুসলিম হওয়ার পরও পূর্ব স্বামীর নিকট থেকে মদ ও শূকর আদায় করে তা দিয়ে ভুরি ভোজ করবে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফেসর সাহেবও তাই মনে করেছেন। তাই তো তিনি বলেছেন এ ফাতওয়ায় মদ ও শুকরকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। নিরেট বোকা লোকেরা এভাবে চিন্তা করতে পারে। এই মাসয়ালার কোথাও কি মদ ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে? আলেম-ওলামারা তো দূরের কথা কোনো সাধারন মুসলিমও কি এটা বলতে পারে! অনেকে বলতে পারে মদ বা শূকর যখন খাবে না তখন মদ ও শূকর পাবে এমন বলা হচ্ছে কেন? বিভিন্ন ভাবে এ কথাটির উত্তর দেওয়া যায়। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ উত্তরটি আমরা এখানে উল্লেখ করবো যাতে সর্ব স্তরের পাঠক তা অনুধাবন করতে পারেন।

ধরে নিই একজন স্ত্রী লোক কাফির অবস্থায় মদ ও শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করেছে। যেহেতু কাফিরদের তাদের নিজেদের ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ করার সুযোগ ইসলামী রাষ্ট্রে থাকবে। অতএব, এই বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং উক্ত মহিলা মদ ও শূকরের অধিকারী হবে। ধরে নিই স্বামীর নিকট হতে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়ার পূর্বেই সে মুসলিম হয়ে গেল। এখন যে শূকর ও মদ উক্ত বিবাহে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল তার বিধান কি হবে? সেটা কে পাবে এবং তার উপর কর্তৃত্ব কে করবে? মোটা বুদ্ধির অনেকে বলতে পারে উক্ত নও মুসলিম মহিলা ওসব মদ বা শূকর দিয়ে করবে টা কি? সে ওটা ছেড়ে দেবে। আমি বলব, এর চেয়ে অধিক উত্তম ও সওয়াবের কাজ উক্ত নও মুসলিম মহিলা করতে পারে। আর তা হলো উক্ত মদ ও শূকর আদায় করে নিয়ে, মদ ফেলে দেওয়া এবং শূকর হত্যা করা। [১৫] মদ নষ্ট করা এবং শূকর হত্যা করার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ দেওয়া

---

[15] বিভিন্ন বৈধ পন্থায় কোনো মুসলিম মদের মালিকানা পেলে উক্ত মালিকানা সূত্রে মদ হস্তগত করা ও তা নষ্ট করে ফেলার কথা হিদায়ার ব্যাখ্যা ফাতহুল কাদীরে এবং অন্যান্য হানাফী ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছ।

হয়েছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে জিজিয়া প্রদান করে যেসব যিম্মী কাফির বসবাস করে তাদের মালীকানাধীন মদ বা শূকর নষ্ট করার বিধান ইসলামে নেই। এখন কোনো মুসলিম যদি ওয়ারিশ সূত্রে বা উপরোক্ত ঘটনার মতো বিবাহের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে কিছু পরিমান মদ বা কয়েকটি শূকরের মালিকানা পায় তবে সেগুলো কাফিররদের নিকট ছেড়ে না দিয়ে তা আদায় করে নেওয়া তার জন্য বৈধ। এভাবে আদায় করে নেওয়ার পর সে উক্ত মদ নষ্ট করে এবং শূকর হত্যা করে আল্লাহর দরবারে কিছু সওয়াব হাসিল করতে পারে। নিজের প্রাপ্য জিনিস কাফিরদের নিকট ছেড়ে দিয়ে তাদের মদ পানের সুযোগ করে দেওয়ার চেয়ে এটিই অধিক কল্যাণকর নয় কি?

এখন চিন্তা করে দেখুন তো "উক্ত নও মুসলিম মহিলা মদ ও শুকর পাবে" এই কথাটি শিরক-কুফর বলে মনে হচ্ছে কিনা। সত্য কথা হলো বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের কথা বুঝতে হলে নিজের মাথাতেও কিছু ঘিলু থাকতে হবে।

পাগলের পক্ষে ওকালোতী

৩৯ পৃষ্ঠাতে প্রফেসর সাহেব হিদায়ার বেশ কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে,

ক. যদি স্ত্রীকে বলে, "তুমি গতকাল তালাক অথচ বিবাহ করেছে আজ তাহলে তালাক হবে না।"

খ. আর যদি বলে, তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তোমার প্রতি তালাক, তাহলে তালাক পতিত হবে না।

গ. আর যদি বলে আমি যদি তোমাকে তালাক না দিই তবে তুমি তালাক তাহলে স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না।

এসব বর্ণনা উল্লেখ করে প্রফেসর সাহেব বেজায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন এসব তো পাগলের প্রলাপ। এসব উদ্ভট কথা পাগল ছাড়া কেউ কি বলতে পারে! সুতরাং হেদায়া হলো শরীয়তকে নিয়ে ছিনিমিনি ও পাগলামী করার এক আজব গ্রন্থ!

প্রফেসর সাহেব এসব কথাকে পাগলামী মনে করেছেন অথচ আমরা দেখেছি তিনি নিজে তার গ্রন্থে এর চেয়ে ঢের বেশি পাগলের পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন-হাদীস বিকৃত করা, অকারণে ওলামায়ে-কিরামকে নিন্দা-মন্দ করা, উদ্ভট ও আজগুবী ফতোয়া দেওয়া ইত্যাদি যা

কিছু তিনি করেছেন তাতে আমার সন্দেহ হয়েছে তিনি পাবনায় বসে বইটি লিখেছেন কিনা। শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে তিনি ছিনি-মিনি খেলেছেন। তবু দুর্ভাগ্য যে আমাদের এসব কথার জবাব লিখতে হয়েছে। এ দোষ তো আমাদের নয় বরং তার নিজের। হিদায়ার গ্রন্থকারের যুগেও নিশ্চয় এ ধরনের পাগল বিদ্যমান ছিল। তারা এসব উদ্ভট কথা-বার্তা বলতো তাই বাধ্য হয়ে বেচারাকে সেসবের বিধি-বিধান লিখতে হয়েছে। একারণে তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বরং যারা পাগলামী করেছে তাদের দোষারোপ করুন। গতকাল তালাক দেওয়া বা বিয়ের আগেই তালাক দেওয়া যে, অসম্ভব সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই তো হিদায়ার গ্রন্থকার এখানে তালাক না হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি তো দক্ষ চিকিৎসকের মতো রোগ নির্ণয় করে সঠিক ঔষধ দিয়েছেন। বৃথা পাগলদের পক্ষে ওকালোতী করে পাগলের চিকিৎসককে দোষ দিচ্ছেন কেনো? অবশ্য যে যেমন ব্যক্তি সে তেমন ব্যক্তির পক্ষ নেবে এটাই স্বাভাবিক।

এরপর প্রফেসর সাহেব এধরনের আরেকটি মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, হিদায়াতে আছে, "কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে দিন তোমাকে বিবাহ করবো

সে দিনই তোমাকে ত্বালাক্ব দেব। অতঃপর সে তাকে রাতে বিবাহ করল তাহলে সে ত্বালাক্বপ্রাপ্তা হয়ে যাবে।

প্রফেসর সাহেব এর উপর আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, " বিয়ে করার আগেই স্ত্রী হয় কি করে? যেদিন বিয়ে করবে সেদিনই তালাক্ব হবে তাহলে বিয়ে করা কেন?"

এরপর তিনি এ ধরণের বিয়ে যে করে, যে পড়ায়, যারা এর আয়োজন করে তাদের সকলকে উম্মাদ, পাগল আর বিকৃত মস্তিস্ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

কথা হলো, সমাজের লোক পাগল ছিল এ কারণে হিদায়ার গ্রন্থকারকে নিন্দা করে লাভ কি? তিনি তো কেবল বিধান শুনিয়ে দিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে তালাক্ব হয়ে যাবে যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

তিনটি জিনিসে তামাশা করে বললেও কার্যকরী হয়, সিরিয়াসলী বললেও কার্যকরী হয়- বিবাহ, তালাক ও রজয়াত। (১৬)

সুতরাং একদল লোক তামাশা করছে অতএব তাদের উপর তালাকের বিধান প্রজোয্য হবে না এমন নয়।

---

(১৬) আবু দাউদ ইঃফাঃ খন্ড-৩, পৃষ্ঠাঃ ১৭৭, হাঃ ২১৯২।

এখানে দেখতে হবে সে যে ভাষা ব্যবহার করেছে তা শরীয়তে তালাক হিসেবে গণ্য কিনা এবং যে সময় দিয়েছে তা সম্ভব কিনা। উপরের উদাহরণ সমূহতে দেখা গেছে বিবাহ করার আগেই তালাক্ব দেওয়া বা তালাক্ব না দিলে তুমি তালাক এমন অসম্ভব কথা বলার কারণে হেদায়ার গ্রন্থকার সেখানে তালাক্ব হবে না এমন ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু যেদিন বিবাহ করবো সেদিন তালাক দেবো এই তালাক যেহেতু সম্ভব তাই এটাকে তালাক্ব হিসেবে গণ্য করেছেন। বোঝা যাচ্ছে পাগলদের এসব পাগলামী দেখে তিনি মোটেও বিগড়ে যাননি বরং ঠান্ডা মাথায় যার যে চিকিৎসা দরকার তা প্রদান করেছেন। আমরা মনে করি প্রফেসর সাহেবও যদি হিদায়ার গ্রন্থাকারের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ চাইলে তার আশু আরোগ্য হতে পারে। অতএব, তাকে নিন্দা না করে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ।

শারয়ী দন্ডবিধি তথা হুদুদ সম্পর্কে আলোচনা।

৩৪ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রফেসর সাহেব যিনা, মদ পান, চুরি করা ইত্যাদি নানা বিষয়ের শরয়ী শাস্তি তথা হদ কায়েম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি হিদায়া

থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করে তা কুরআন-হাদীসের বিরোধী প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রফেসর সাহেব যদি হিদায়া কিতাবের হদ কায়েম করা সংক্রান্ত অধ্যায়টি মনযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ পাঠ করতেন তাহলে হয়তো কিতাবটির উপর এতো বেশি ক্ষিপ্ত হতেন না। কিন্তু তিনি কেবল চোখ বুলিয়ে গেছেন আর যেখানে নিজের মন মতো দু-একটা কথা খুঁজে পেয়েছেন কাঠ-কুড়ানির মতো সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের গ্রন্থে লিখে দিয়েছেন। হিদায়া গ্রন্থের উপর তিনি যেসব আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তার কারণ হলো, কয়েকটি বিষয়ে তার অজ্ঞতা। নিচে পর্যায় ক্রমে আমরা সেসব বিষয় উল্লেখ করছি।

ক. প্রফেসর সাহেব মনে করেছেন, যে অপরাধের হদ নেই সেটা হালাল। একারণে হিদায়া কিতাবে যে অপরাধের হদ জারী হবে না বলা হয়েছে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছেন "এটা হারামকে হালাল বলে গণ্য করা নয় কি?"। হিদায়াতে স্বীয় স্ত্রী ছাড়া অন্যদের সাথে জিনা করার পরও হদ্দ কায়েম না হওয়ার কিছু মাসয়ালা রয়েছে। এসব মাসয়ালার যুক্তি-প্রমাণ আমরা পরে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ। প্রফেসর সাহেব এসব মাসয়ালা উল্লেখ করে বলেন,

“এমন যৌন কাজ যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাও যদি ইমাম সাহেব হালাল করে দেন তবে দিতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি দিয়েছেন? না তার অনুসারীরা এটা হালাল করে নিয়েছে? বাহ! এমন ব্যাভিচারের সুযোগ যে দলে আছে সেখানে তো দলে দলে বদমাইশ যেনাখোররা ছুটবে। সে দলকে আর যাই বলা যাক মুসলিম বলার সুযোগ নেই।” [নাউযু বিল্লাহ]

এই মুর্খ প্রফেসরকে প্রশ্ন করে লাভ নেই আমি বরং বিজ্ঞ পাঠককে প্রশ্ন করি কোনো একটি অপরাধে হদ কায়েম হবে না একথা বললেই কি উক্ত কাজকে হালাল মনে করা হয়?

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي

চোখের জিনা হলো (হারাম নারী বা পুরুষের দিকে) তাকানো, মুখের জিনা হলো, (অশ্লীল বিষয়ে) কথা বলা, অন্তরের জিনা হলো (অশ্লীল বিষয়) কল্পনা করা। [১৭]

এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অশ্লীল কিছু করাকেও জিনা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টি দিলে বা এমন কি তাকে স্পর্শ করলেও কি হদ্দ

[১৭] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড-৯, পৃষ্ঠাঃ ৫১৮, হাঃ ৫৮০৯।

কায়েম হবে? প্রফেসর সাহেবের হয়তো বিষয়টা নাও জানা থাকতে পারে তবে সত্য কথা হলো কোনো বেগানা নারীর সাথে বিছানায় শয়ন করে একে অপরের সাথে বাহ্যিকভাবে যত কিছুই করুক তাতে হদ্দ কায়েম হবে না যতক্ষণ না উভয়ের বিশেষ অঙ্গ একটির সাথে আরেকটি মিলিত হয়েছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়টিকে হাদীসে বলা হয়েছে, (مثل الميل في المكحلة) "সুরমার কৌটার মধ্যে কাঠিটি যেভাবে যাওয়া আসা করে"। [আবু দাউদ]

মোট কথা হদ্দ কায়েম হওয়ার জন্য এ ধরণের জিনা হওয়া আবশ্যক। কেবল বিছানায় দুজন একে অপরের উপর শয়ন করা বা লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য কোনো স্থানে উপভোগ করার মাধ্যমে হদ্দ কায়েম হবে না। এর অর্থ কি এই যে, ওসব কাজ হালাল? যারা এমন মন্তব্য করে দ্বীন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা কি পরিমান সেটা পাঠক ভেবে দেখবেন। এসব অজ্ঞ লোকের পক্ষে হিদায়া গ্রন্থের ত্রুটি অন্বেষণ করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা কতটা স্পর্ধা ও অনধিকার চর্চা সেটিও লক্ষ্য রাখবেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, হিদায়ার গ্রন্থকার নিজেও বিভিন্ন স্থানে কোনো একটি ব্যাপারে হদ্দ কায়েম হবে না বলার পর বলেছেন,

لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر

কেননা এটা এমন একটি মুনকার (পাপের কাজ) যে বিষয়ে নির্দিষ্ট শাস্তি শরীয়তে নেই। [মুল আওয়ালাইন-৫১৬ ইঃফাঃ ২য় খন্ড ৩৬৪]

বেশ কিছু স্থানে তিনি এও বলেছেন যে, যদিও এসব অপরাধের হদ (নির্ধারিত শাস্তি) নেই তবে তা'জির (কাজির ইচ্ছামত যে কোন লঘু শাস্তি) প্রদান করতে হবে।

কেউ হয়তো বলবে, তা'যির কি? এটা আমরা মানি না। বোকা লোকের প্রশ্নের শেষ নেই। কিন্তু তাই বলে আমরা এখন তা'যির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো না। গরুর রচনা লিখতে যেয়ে তাল গাছের রচনা লেখাটা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাছাড়া এখানে আমার মুল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো হিদায়ার গ্রন্থকার যেসব বিষয়ে হদ্দ নেই বলেছেন সেগুলোকে হালাল মনে করেন এটা একটা নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য অপবাদ। কিন্তু দুঃখজনক যে, কিছু অশিক্ষিত ও বোকা লোক এই অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং প্রফেসর সাহেবের গ্রন্থটি যারা বেশ গুরুত্ব সহকারে পাঠ করেন ও প্রচার করেন তাদের বলবো এই অপপ্রচারে তার সঙ্গী হবেন কিনা সে বিষয়ে দয়া করে

একটু নজরে ছানী করবেন।

খ. ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মত মূল নীতি হলো, (الشبهة تدرأ الحدود) "সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলে হদ্দ কায়েম করা যাবে না"। যেহেতু হদ্দ কায়েম করা হয় মুসলমানের উপর আর মুসলমানকে হত্যা করা বা তাকে যে কোনো ভাবে আঘাত করা মারাত্মক অপরাধ। কেবল যখন নিশ্চিতভাবে জানা যায় সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে তখন তাকে উক্ত শাস্তি প্রদান করা যায়। অতএব, এ ব্যাপারে যে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হলে তার উপর উক্ত শাস্তি প্রদান করা যায় না। তবে যে ধরনের সন্দেহের কারণে হদ্দ কায়েম হবে না তার প্রকার ও পরিমানের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত হয়েছে। যারা এই মূলনীতি সম্পর্কে জানে না তারা মনে করে, যেকোনো ভাবে হদ্দ কায়েম করতে পারলেই আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে গেলো। কিন্তু এভাবে হদ কায়েম করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপরাধ লোক শাস্তি পেয়ে যাবে। একারণে ওলামায়ে কিরাম প্রকৃত অপরাধী কে তা প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সুক্ষ্ম নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেছেন। বুদ্ধিমান মাত্র এসব নিয়মনীতির কার্যকারীতা স্বীকার করে। আর বোকারা বলে, এসব তো মনুষ্য

সৃষ্ট। আসলে কুরআন-হাদীস কেবল পাঠ করে মুখস্থ করা যতটা সহজ বাস্তবে তা প্রয়োগ করা ততটা সহজ নয়। তার চেয়েও বেশি কঠিন মানুষের মাঝে ইনসাফ মতো বিচার করা। একজন বিচারককে কত মানুষের মাল-সম্পদ ও জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা করতে হয়! সে যদি সতর্কতা অবলম্বন না করে তবে কাল-কিয়ামতের ময়দানে তাকে যে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে সেটা স্মরণ রাখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটি কত কঠিন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

যাকে কাজির (বিচারকের) পদ দেওয়া হয় তাকে যেনো ছুড়ি ছাড়াই যবেহ করা হলো। (১৮)

একারণে বিচারকের বুদ্ধি হতে হবে ধারালো ব্লেডের মতো প্রখর আর তার সিদ্ধান্ত হবে ইস্পাতের মতো কঠিন। একজন লোককে ধরে এনেই বেত মেরে দেওয়া বা হত্যা করে ফেলা এটা আমেরিকা-ব্রিটেন তথা কাফির মুশরিকদের কাজ। কোনো মুসলিম এভাবে চিন্তা করে না।

এ বিষয়ে আমরা সুলাইমান عليه السلام এর ন্যায়-বিচারের

(১৮) আবু দাউদ ইঃফাঃ খন্ড-৪, পৃষ্ঠাঃ ৪৪১, হাঃ ৩৫৩৩।

কাহিনীটি উল্লেখ করতে পারি। দুজন মহিলা একটি মাত্র সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করলে দাউদ ﷺ তাদের বক্তব্য শ্রবন করে ইজতিহাদ করে বড় মেয়েটিকে সন্তানটির মা হিসেবে রায় দেন। কিন্তু সুলাইমান ﷺ তাদের ডেকে এনে পুনরায় বিচার করেন। প্রকৃতই কে সন্তানের মা তা বোঝার জন্য তিনি একটি কৌশল করেন। তিনি বলেন, একটি তরবারী নিয়ে এসো আমি সন্তানটি দু'ভাগ করে দু'জনের মধ্যে বন্টন করে দেবো। এতে বড় মহিলাটি সন্তুষ্ট হয় কিন্তু ছোট জন বলে, না, না। এমন করবেন না। সন্তানটি আসলে তার। তাকেই দিয়ে দেন। এটা শুনে সুলাইমান ﷺ বুঝতে পারেন এই মহিলাটিই আসলে সন্তানের মা। ফলে তিনি তাকেই সন্তানটি প্রদান করেন। [১৯]

হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম কাউকে দন্ডবিধি প্রদানের পূর্বে এ ধরনের সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন। তারা এ বিষয়ে দক্ষ ও যোগ্য ছিলেন। যেহেতু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হানাফী আলেম-ওলামা বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন বাদ-বিবাদ ও অপবাদ অপরাধের স্বরূপ

[১৯] বুখারী ইঃফাঃ খন্ড-৬, পৃষ্ঠাঃ ১১৭, হাঃ ৩১৮৬।

সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত ছিলেন। কিভাবে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সে সম্পর্কেও তাদের অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্য মাজহাবের যেসব ওলামায়ে কিরাম তাদের সমকক্ষ ছিলেন এবং তাদের মতো জ্ঞানী ও দক্ষ ছিলেন তারাও হানাফী ওলামায়ে কিরামের এসব দক্ষতাকে স্বীকার করেছেন। একারণে তারা বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমতে জড়িয়ে পড়া স্বত্ত্বেও একে অপরকে তিরস্কার করেননি। হারামকে হালাল করার অভিযোগও দেননি। সমস্যা হলো, বর্তমান যুগের লা-মাযহাবীদের বিচার কার্য পরিচালনা করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। সৌদি আরবের দু-একজন সালাফী যদি কাজির পদ পেয়েও থাকে তবু তাকে বিচার করতে হয় আমেরিকা পন্থী বাদশার মর্জি মতো। ফলে নিজে থেকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। বরং রাজা ইজতিহাদ!! করে যে ফরমান জারি করেন তাই শুনিয়ে দেন। সুতরাং বাস্তবতা সম্পর্কে এরা ভীষণ অজ্ঞ। এদের জ্ঞান কেবল কিতাব-পত্রে সীমাবদ্ধ। আবার এই কিতাব পত্রও তারা খুব কমই পাঠ করেন আর পাঠ করলেও খুব কমই স্মরণ রাখেন। একারণে হানাফী ওলামায়ে কিরামের সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিকে তাদের নিকট শরীয়ত বিরোধী মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রফেসর

সাহেব ৩৫ পৃষ্ঠাতে হিদায়ার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। সেখানে বলা হয়েছে,

দু'জন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক স্ত্রী লোকের সাথে বলপূর্বক জেনা করেছে আর অপর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, স্ত্রী লোকটি তাকে স্বেচ্ছায় সুযোগ দিয়েছে। তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম হবে না।

বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর প্রফেসর সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "বল পূর্বক জেনা করুক আর স্বেচ্ছায় জেনা করুক উভয়টি তো জিনা। আর বলপূর্বক বা স্বেচ্ছায় উভয়টির বেলায় সাক্ষ্য যখন বিদ্যমান তাহলে কুরআনী শাস্তি হতে উভয়ে কেমনভাবে রেহাই পেতে পারে? ঢালাওভাবে শাস্তি মওকুফ হলে জিনার ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার আর কি কিছু বাকী থাকে?

এই মাসয়ালাতে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে,

ক. স্ত্রী লোকটির উপর হদ কায়েম না করা।

খ. পুরুষ লোকটির উপর হদ কায়েম না করা।

প্রফেসর সাহেবের বড় বোকামী হলো তিনি বলেছেন, "উভয়ে কুরআনী শাস্তি হতে কিভাবে রেহাই পেতে পারে"।

অর্থাৎ তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর হদ কায়েমের

ফতোয়া জারি করতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই মাসায়ালাতে স্ত্রী লোকটির উপর হদ কায়েমের ফতোয়া জারি করা ভীষণ অন্যায়। যেহেতু চার জন সাক্ষী পূর্ণ না হলে কারো উপর জেনার হদ্দ কায়েম করা যায় না। আর যদি প্রমাণিত হয় কোনো মহিলাকে কেউ জিনা করতে বাধ্য করেছে তাহলেও উক্ত মহিলার উপর হদ কায়েম করা যায় না। যেহতু উক্ত মহিলা জেনা করেনি বরং ধর্ষিতা হয়েছে। এখানে উক্ত মহিলাটি দুই দিক থেকে শাস্তি হতে রেহাই পায়।

প্রথমত. তার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় জেনা করার সাক্ষী মাত্র দুই জন। আর বাকি দুজন বলেছে বল পূর্বক ধর্ষনের কথা। কিন্তু চার জন ছাড়া জেনার শাস্তি দেওয়া যায় না। অতএব, তার শাস্তি হবে না।

দ্বিতীয়ত: উক্ত মহিলা স্বেচ্ছায় জেনা করেছে না কি তাকে জোরপূর্বক ধর্ষন করা হয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে হদ কায়েম করা যায় না। এই মুলনীতি অনুযায়ী এমনকি যদি চারজন সাক্ষী বলতো অমুক মহিলা স্বেচ্ছায় জেনা করেছে আর অন্য দুজন লোক বলতো তাকে জোরপূর্বক ধর্ষন করা হয়েছে তবু এমন বলার সুযোগ থাকতো যে, উক্ত মহিলার উপর হদ জারি হবে না।

যেহেতু চার জনের সাক্ষ্য সঠিক কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আর সন্দেহের সৃষ্টি হলে হদ জারী হয় না। এখন হিদায়ার গ্রন্থকার উক্ত মহিলার উপর হদ জারি করেননি বিধায় তিনি জেনাকে হালাল মনে করেছেন এমন মনে করার সুযোগ আছে কি?

সুতরাং স্ত্রী লোকটির উপর হদ কায়েম হতে পারে না এটা সুনিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হলো, পুরুষ লোকটি সম্পর্কে। ইমাম আবু হানীফা ﵀ বলেছেন, স্ত্রী লোকটির মতোই পুরুষ লোকটির উপরও হদ কায়েম হবে না। প্রফেসর সাহেব বিষয়টিকে নিন্দা করেছেন। এখানে তিনি মুল বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। যখন চারজন সাক্ষী কারও ব্যাপারে জিনার সাক্ষ্য দেয় প্রফেসর সাহেবরা তখনই তার উপর হদ লাগানোর বিধান দিচ্ছেন কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এই চারজন কোনো কারণে তার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে? এখন সত্য মিথ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায় এর সমাধান প্রফেসর সাহেবদের নিকট নেই। যেহেতু তিনি বা তার উস্তাদবর্গ বাস্তবে কখনও বিচার কার্য সম্পাদন করেননি। কিন্তু ওলামায়ে দ্বীন এ ব্যাপারে চমৎকার একটি সমাধান বের করেছেন। তারা চারজন সাক্ষীকে কিছু অতিরিক্ত জেরা করেন। যেমন, জেনা কোথায়

হয়েছিল? দিনে হয়েছিল না কি রাতে হয়েছিল? সকালে না বিকালে? স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায়? যদি এসব ক্ষেত্রে সকলে একই কথা বলে তবে তো সাক্ষ্য সত্য প্রমাণিত হলো আর যদি একেক জন একেক রকম বলে তবে বোঝা গেলো তারা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। মুল তত্ত্ব হলো, যখন চার জন লোক কারও ব্যাপারে অপবাদ দেয় তারা একত্রে বসে কি বলবে আগের থেকেই ঠিক করে নেয়। কিন্তু সাধারনত মিথ্যায় কোনো না কোনো ফাঁক থাকে। কাজি কি প্রশ্ন করবে সেটা তো আর তারা আগে থেকে জানে না তাই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আগে থেকে ঠিক করে নেওয়াও সম্ভব নয়। যদি তারা সত্যিই ঘটনাটি দেখে থাকে তবে তো এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে আর যদি বানিয়ে বলে থাকে তাহলে কোন না কোন প্রশ্নের উত্তরে গরমিল হবে। সেক্ষেত্রে আদৌ জিনা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। ফলে হদ বাতিল হবে।

উল্লেখিত ঘটনাটির উপর চিন্তা করলে দেখা যাবে, যদি চার জন সাক্ষীই উক্ত জেনা সম্পাদিত হতে দেখতো তবে এখানে মহিলাটি স্বেচ্ছায় জেনা করেছে নাকি তাকে বাধ্য করা হয়েছে সে বিষয়ে তারা দ্বিমত করতো না। যেহেতু কোনো মহিলাকে জোরপুর্বক ধর্ষন করা

হচ্ছে না কি সে স্বেচ্ছায় জেনা করছে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির তা বুঝতে কোনোরূপ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে একজন মহিলার প্রতিক্রিয়া ও পারিপার্শিক অবস্থা সমান হয় না। এটা প্রমাণ করে যে, এই চার জন সাক্ষী ঘটনা স্থলের সাক্ষী নয় বরং মিথ্যা সাক্ষ্য দান কারী।

এ বিষয়ে আরও একটি চমৎকার উত্তর রয়েছে যা হিদায়ার গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রফেসর সাহেব তা লক্ষ্য করেননি বা লক্ষ্য করলেও তা বুঝার মতো দক্ষ তিনি নন। ব্যাপারটি হলো, আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, স্ত্রী লোকটির ব্যাপারে জিনার বিধান প্রমাণিত নয়। যেহেতু জিনা কেবল তখন প্রমাণিত হবে যখন চার জন সাক্ষী উক্ত স্ত্রী লোক সেচ্ছায় জেনা করেছে মর্মে সাক্ষী দেবে। নিয়ম হলো যদি এক দুই বা তিন জন লোক কোনো স্ত্রী লোক সম্পর্কে জেনা করার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু তাদের সংখ্যা চার পর্যন্ত না পৌছায় তবে উক্ত তিন জন উক্ত মহিলার উপর অপবাদ দিয়েছে বলে গণ্য হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]

যারা সতি নারীকে অপবাদ দেয় তার পর চার জন সাক্ষী হাজির করতে সক্ষম না হয় তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো আর কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।

[নূর/৪]

সুতরাং যে দুজন লোক উক্ত মহিলা স্বেচ্ছায় জেনা করেছে বলে দাবী করেছে অপর দুজন সাক্ষীর ভিত্তিতে মিথ্যাবাদী ও অপবাদ দানকারী হিসেবে গণ্য। ফলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এখন বাকী থাকে কেবল দুজন সাক্ষী যারা উক্ত পুরুষ লোকটি জোরপূর্বক জেনা করেছে বলে দাবী করছে। পুরুষ লোকটির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক জেনা করাও শাস্তিযোগ্য কিন্তু এখানে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী তো পাওয়া যাচ্ছে দু'জন আর চার জন সাক্ষী ছাড়া হদ কায়েম করা যায় না।

এই সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের পর আশা করি প্রফেসর সাহেবরা বুঝতে পারবেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে তারা কোন জঙ্গলে অবস্থান করছেন!

এভাবে প্রফেসর সাহেব আর যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার সবগুলোর কোনো না কোনো মুলনীতি রয়েছে। তার মধ্যে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে যা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

সম্ভব হলে সেসব বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ। পাঠক ইচ্ছা করলে হিদায়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকেও ঐ সকল বিষয়ে জেনে নিতে পারবেন। যদি কেউ বলে, আমরা তো আরবী বুঝি না ঐ সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ কিভাবে পড়বো? তাদের বলি, আরবী না জানলে দয়া করে একটি আরবী বইয়ের ভুল ধরতে আসবেন না। হিদায়াতে কোনো ভুল থাকলে সেটা ধরিয়ে দেওয়া আপনার ঈমানী দায়িত্ব নয়। যেহেতু আপনি এর যোগ্য নন। আল্লাহ কারও সাধ্যের বাইরের কোনো দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দেন না। এটা বুঝার চেষ্টা করুন। আরবী ভাষা না জানলে এবং শরীয়তের মুলনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হলে আপনি হিদায়া কিতাব বা অন্য কোনো ফিকাহ গ্রন্থের ভুল শুধরে দেওয়ার যোগ্য নন। সেটা অভিজ্ঞ আলেম-ওলামাদের কাজ। কোনটি ভুল কোনটি ভুল নয় সেটা তারাই বুঝবেন। সেসব ব্যাপারে কীভাবে আলোচনা করলে শরীয়ত সম্মত হয় সেটিও তারা জানেন। পুর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ বা তিরস্কার তাচ্ছিল্য না করেও কীভাবে ভুল শুধরে দেওয়া যায় সেটা তারা বোঝেন। যদি আপনি মনে করেন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না তবে সে

দায়ভার তাদের। ডাক্তারের ঔষধে রোগ ভাল না হলে আপনি নিজেই নিজের আপারেশন শুরু করতে পারেন না। আর যদি করতেও হয় তবু আগে ডাক্তারি বিদ্যা ভাল মতো রপ্ত করুন। তারপর চেষ্টা করে দেখুন।

পাঠককে আমি শুধু এতটুকু স্মরণ করিয়ে দেবো; যার বই পাঠ করে আপনি হিদায়ার মতো সুবিখ্যাত গ্রন্থের নিন্দা-মন্দে লিপ্ত হচ্ছেন তার জ্ঞানের অবস্থা তো স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। হিদায়ার যেসব বিষয় জটিল মনে হয়েছে সেগুলোর যে সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে তারও কিছু নমুনা পেলেন। এখন প্রফেসর সাহেবের বইটির উপর নির্ভর করে বা আপনার স্বল্প জ্ঞানে কোনো কিছু জটিল মনে হলেই তার উপর ভিত্তি করে বরেণ্য ওলামায়ে কিরামকে নিন্দা-মন্দ করা কি আপনাদের জন্য উচিৎ হবে? আর যদি কেউ সেই কাজই করতে চান তবে করুন তাতে আমাদের কিই বা করার আছে?

{قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} [الزمر: ٣٩]

বলুন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের মতো আমল করতে থাকো আর আমিও আমল করতে থাকি। তারপর শীঘ্রই জানতে পারবে। [যুমার/৩৯]

লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)

২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)

৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)

৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস

৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)

৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)

৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী

৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)

৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)

১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে

১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা

১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন

১৩. দরবারী আলেম

১৪. মারেফাত

১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৬. ছোটদের আক্বাইদ

১৭. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল

১৮. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)

১৯. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)

২০. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২১. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)

২২. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)

২৩. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)

২৪. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)

২৫. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)

২৬. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)

২৭. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)

২৮. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)

২৯. বায়াত, (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???

৩০. কল্পনায় জান্নাত

* ভাষা শিক্ষা:

৩১. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)

৩২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তিতে ভ্রান্তি (গবেষণা গ্রন্থ)

৩. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)

৪. সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)